প্রকাশক :
পান পাবলিশিং কোম্পানীর পক্ষে,
শ্রীপ্রশান্ত কুমার পান এম. এস-সি.
২০৩/৪ ডি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬



প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮২
চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৪
পঞ্চম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৫

মূল্য : বারো টাকা মাত্র।

মুদ্রক :
শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৪

# সূচীপত্র

## পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

শিক্ষক / শিক্ষিকা সহকর্মীগণের সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে 'মধ্যযুগের ইতিকথা'র নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই সংস্করণে 'ইসলাম ধর্ম ও তার অবসান' অধ্যায়টি কিছু সংস্কার করা হয়েছে। আশা করি পূর্বের ন্যায় এবারের সংস্করণটিও ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল সমর্থনলাভে বঞ্চিত হবে না। ইতি—

মেদিনীপুর কলেজ
জানুয়ারী, ১৯৮৫

বিনীত
শ্রীরাজমোহন ভট্টাচার্য

## ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পুস্তক পর্যালোচকগণের নির্দেশানুযায়ী 'মধ্যযুগের ইতিকথা' মুদ্রিত হ'ল। 'মধ্যযুগের ইতিহাস' খুবই জটিল এবং বিস্তৃত। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে বিস্তৃত বিষয়কে তুলে ধরা খুবই দুরূহ কাজ। প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের ভিত্তিতে সরলমতি ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে যথাসম্ভব সরল ভাষায় ঘটনাসমূহ বিবৃত করার প্রয়াসী হয়েছি। বইটি লিখতে মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত গ্রন্থাগারিক আজহারউদ্দীন খান মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীলক্ষ্মী দাস মহাশয় ছবিগুলি সযত্নে অঙ্কন করে বই-এর শ্রীবৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন। পরিশেষে উল্লেখ করি এই বই-এর প্রকাশক শ্রীপ্রশান্ত কুমার পানের নাম—যার অকৃত্রিম উৎসাহ না পেলে আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হ'ত না। তার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে তাকে ধন্যবাদ জানাবার প্রশ্ন ওঠে না।

বইটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে তবুও ত্রুটি কিছু থাকলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমারই। যাদের উদ্দেশ্যে বইটি লিখলাম তারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। বইটির গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক / শিক্ষিকা মহোদয় / মহোদয়াগণের মতামত সাদরে গ্রহণ কর'ব। ইতি—

বিনীত
শ্রীরাজমোহন ভট্টাচার্য

# SYLLABUS ON HISTORY OF MEDIEVAL CIVILISATIONS
## CLASS VII

1. Meaning of the term Medieval : (a) Erom overthrow of the last Roman Emperor 476 A. D. to the rise of new Society, new State, new learning, new economic patterns. (b) In India—from the end of the Gupta Era (although 'Feudal' relations had started from the 5th Century). (c) The time priod in both cases—roughly 5th Century to 15th Century A.D. (d) Periodisation is arbitrary because of gradual transition, in some respect the old merging into the middle ages. (e) Middle ages—not the same period everywhere. (f) No Single Pattern. Unequal and varied developments.

2. The Middle Ages in the West : (a) Advent, pressute of Hune upon Germanic Tribes—their migration into the Western part of the Roman Empire—fall of the Empire ( 476 A. D ) Survival of Roman law and Roman idea of imperial unity. (b) A short referance to Alaric, Atilla, Gaeseric. (c) Social, political and religous life of the migrants, a brief account only of their settlements in the imperial territories—mix-up with Roman population. Christain influence upon the settlers.

3. The myth of "dark age" in Europe : 4th to 7th Century—not 'dark'; learning was kept alive in monosteries—eccleciastical concept of right and wrong functioned as a civilising insluence.

4. The Byzantine Civilisation : (a) Constantine founds Constantinople and makes christianity the official religion of Byzantium. (b) Justinian's efforts to establish unified empire ( without details about wars ). Justinian's Law Code, its importance, patronage of architecture and painting. (c) Importance of Byzantium as a centre of trade and commerce, preserver of culture (Literature, Philosophy, Science ).

5. Islam and ets impact: (a) The Arabs—land and people. The prophet and his teachings; 'factors which facilitated the spread of Islam; The Caliphs, the Arab Empire: Cordova; How Europe reacted to the achievements of Islam Arab contributions to Culture, arts and Sciences, Scholarship. Some scholars.

6. Western Europe in Medieval period ( 800—1200 A. D. approx ): (a) Charlemagne—revival of the Holy Roman Empire ( 800 A. D. ) Importance of Coronation—relation between State and Church, court and its patronage or art and literature. (b) Monasteries—monks and nuns —life centring round monasteries ( Benedictive Vows ) the role of monasteries in the preservation and dissemination of learning—Cluny ( Freeing the Church from Corruption, Secularisation and Feudalisation ), (c) Investiture issue ( Reference only ). (d) 11th and 13th centuries: from monastic and Catherdral School, Universities—some famous scholars, students and teacher relationship. The growth of studies in Law, Medicine, Theology, as well as logic, liberal arts, literature.

7. Feudalism Medieval Europe: (a) Feudalism: Land —the bond between man and man; The Feudal hierarchy; private assumption of public authority, the role of the Feudal castle and mailed horsemen in saving Europe; Eeudalism — a way of life, institution of chivalry—Troubatours. (b) Manorial System: Manorialism—economic aspects of Feudalism; Manor—the local unit of Eeudal Govt., Manorial Court. Economic conditions: Cultivation by labour of village community; peasants heavy toil and heavy rent—conditions of peasants life. Heavy dues to Lord and church in cash or kind. Manorial life in Castles—Three distinct classes—clergy, nobility and the rest—nobility and peasants at opposite poles. Serf—a chattel of Lord—Obligatory Service, hereditary serfdom; means of escape—joining a holy order running away to town for shelter, getting employed in business and industry, Revolt.

8. The Crusades (1st, 2nd, 4th): Motives—Impact upon Society and Culture—new towns and trade-centres (Italy and particular), Cottage industries, separated from agriculture (11th & 12th Centuries).

9. Growth of Town: Role of the Crusades—Guilds in towns—their activities—a short account of life in towns. Town autonomy by royal character; origin of the term "Bourgeious".

10. The Far East in the middle Ages: China in Medieval period (form early 7th century to 14th century). (a) The Tang period (618—907 A. D.) Re-unfication of China and recasting the laws; Education, learning, literature (poetry); Tea, printing arts. Promotion of trade, Commerce and agriculture, Buddhism in China. Chinese civilization spread to Japan, Korea, Annam. China—a model from emulation. Huien Tsangs' visit to India and his return—impact. (b) The Sung period (960—1280)—important experiments—State control of Commerce State loan to farmers, property Tax—Education and Culture. (c) The Yuan period (1280—1368): The Mongols: Kublai Khan (Tibetan Buddhism) and the account of Marcopolo. (ii) Japan in Medieval period: (a) Society and Eeudal economy in early medieval times. Supremacy of Mikado: Close links with China. Resistance of "Great Families". Mikado combined the office of Shinto High priest and absolute sovereign. Yet the growing power of hereditary clan—families and enrichment of Buddhist orders weakened the central authority. The shogunata. The Samurai, Japanese chivalry (Bushido).

12. India in the Middle Ages: (a) After the Guptas (5th—7th century). Hun incursions from 458 (occupation of Persia, Kabul, North-western India). historical importance of the Hnns. Break of the Gupta Empire: Age of Harshavardhan; shriking of the ideal of imperial unity to only Uttarapathanath: Hiun Tsang's travels—his account; Nalanda—main features of the University. (b) Post-Harshavardhan period (8th to 12th Century): After

Harshavardhan—rise the Smaller States; The 'Rajputs'. The Feudal clannish principalities of Rajputana; Pala, Pratihara, Rastrakuta contest ( reference only ) inability to establish a united empire, smaller kingdoms as vassals. (c) Bengal; Sasanka, Life and Society under the Palas and Senas—Religious and learning ( Vikramsila and Udanapur ). (d) South India—The Chalukyas of Badami and Pahlavas of Kanchi; their contributions to Art and Architecture—Maritime activities of the cholas.

12. Indian's foreign contacts: By land—Mahayana Buddhism in Central Asia, thence to china ( Khotan ruin, Hiune Tsang's evidence ); Tibet ( Atisa Dipankar ) by sea—Settlement and cultural influente in south-East Asia, Subarnabhumi—Yashodharpur and Angkarvat, Angkorthom —Malay, Java—Barabudar.

2. The Sultans of Delhi (1206 to 1525 A. D.): Coming of Turke-Afghans to India (only a breif reference to the motive and manner of their coming); Main features of political, Social and economic life; Mutual inflence of Hinduism and Islam; liberal developments in Arts and culture, translation of classics, Bhakicult ( the medieval Saints )—Sri Chaitanya, Nanak and Kabir. Bengal—Social, and economic conditions in Ilias Shah and Hussian Shah's periods. Short account of the general administrative system.

14. Towards the end of Medieval era ( 14th & 16th Centuries ): Fall of Constantinople: its impact on the Renaissance which had already started in the West, Features of the Renaissance era—sprit of enquiry and reasoning, widening of frontiers of knowledge, Scietific discoveries based on "obsocured facts". Geographical discoveries—its out come. National States—France, England, Portugal, Spain, Struggle for National Freedom ( Dutch ): Expansion of Europe. old order Vs. New order—The English Revolt.

প্রথম অধ্যায়

# মধ্যযুগ কাকে বলে

পাঠ-সংকেত—মধ্যযুগ কাকে বলে ● রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ● ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা ● ভারত ও ইউরোপের যুগ-বিভাগে কালগত সাদৃশ্য ● বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগের সূচনা ● সভ্যতার বিভিন্ন প্রকাশ।

রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ছিলেন রোমুলাস অগাষ্টাস। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমুলাস অগাষ্টাসকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করা হলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এই সময়েই ইতিহাসে প্রাচীন যুগের শেষ হয় এবং আরম্ভ হয় মধ্যযুগের।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রাচীন যুগের ইতিহাস পড়েছ। সেই প্রাচীন যুগে দাসরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে নানা জিনিসপত্র উৎপন্ন করত। তাদের অবস্থা ছিল দুর্বিসহ। ধীরে ধীরে দাসরা তাদের এই শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করে। আরও নানা কারণে দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে চলে বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল। ফলে প্রাচীন যুগের পতন হয়। আরম্ভ হয় আর এক যুগের। এই সময়ে রাজার ক্ষমতা হ্রাস পায়। বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার বা সামন্তরা প্রবল হয়ে ওঠে। জমিদারের সঙ্গে তার প্রজাদের নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাতেও পরিবর্তন আসে। এই যুগকে বলা হয় সামন্ততন্ত্রের যুগ। সামন্ততন্ত্রের যুগে নতুন ধরনের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

ইতিহাসের নিয়মই এই যে চিরকাল কোন ব্যবস্থা একই রকম থাকতে পারে না। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে প্রায় হাজার বছর কাল সামন্ততন্ত্র ইউরোপে টিকে ছিল। এই সময়ে মানুষের মনে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ছিল প্রবল। তারা অন্ধভাবে খ্রীষ্টান যাজকদের কথায় বিশ্বাস করত। ক্রমে ক্রমে তাদের মনের ভয় ভেঙ্গে গেল। দুঃসাহসী নাবিকেরা জলপথে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করল। অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে মানুষ ভালো-মন্দ সব বিচার করতে শিখল। পঞ্চদশ শতকে সকল

ক্ষেত্রেই এইভাবে ব্যাপক পরিবর্তন এল। তাই আরম্ভ হল আবার এক নতুন যুগ। এই যুগকে ঐতিহাসিকরা আধুনিক যুগ বলে আখ্যা দেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে প্রাচীন যুগের শেষ হয়। আবার পঞ্চদশ শতক থেকে সূচনা হয় আধুনিক যুগের। সেইহেতু পঞ্চম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কালকে 'মধ্যযুগ' নামে চিহ্নিত করা হয়।

ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা—তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে গুপ্ত-বংশের ইতিহাস পড়েছ। গুপ্তবংশের রাজারা ছিলেন খুবই প্রতাপশালী। বাহুবলে তাঁরা এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। গুপ্ত সম্রাটরা দুর্বল হয়ে পড়লে তাঁদের সাম্রাজ্য ষষ্ঠ শতকে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। সেই সময়ে ভারতবর্ষে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয় এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ চলতে থাকে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের ইতিহাসের আরম্ভ হয়। ষষ্ঠ শতকে অথবা তার কিছু আগে থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্রের সূচনা লক্ষ্য করা যায়।

রাজারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত। তার ওপর জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কার দেশের ঐক্য শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। এই সুযোগে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজকে তরাইনের যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। মহম্মদ ঘুরীকে কেউ বাধা দিতে পারল না। তারপর থেকেই ভারতবর্ষে শুরু হয় মুসলমান শাসন। দিল্লী ছিল তাদের রাজধানী। এই মুসলমান শাসকদের শাসনকালকে বলা হয় 'সুলতানী আমল'। সুলতানী আমলে বিভিন্ন বংশ একের পর এক রাজত্ব করেছিল। কিন্তু কেবল উত্তর ভারতেই সুলতানরা তাদের প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

লোদী বংশের সুলতান ছিলেন ইব্রাহীম লোদী। তাঁর শত্রুরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আফগানিস্থানের শাসক বাবরকে আহ্বান জানাল। বাবরও ভারতবর্ষ আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিলেন। অবশেষে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে দিয়ে বাবর দিল্লীর সিংহাসন দখল করলেন। তিনিই মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুঘল যুগের আরম্ভ থেকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সেইজন্যই গুপ্তযুগের পতনের পর থেকে সুলতানী আমলের শেষ পর্যন্ত সময়কে ভারত ইতিহাসে মধ্যযুগ আখ্যা দেওয়া যায়।

**ভারত ও ইউরোপ ইতিহাসের যুগ-বিভাগে কালগত সাদৃশ্য**—ভারত ও ইউরোপের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উভয় দেশের ইতিহাসে সময়সীমার মধ্যে মিল রয়েছে।, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়কে ভারতে ও ইউরোপে 'মধ্যযুগ' আখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু পঞ্চম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ রূপে আখ্যা দেওয়া অনেক ঐতিহাসিকেরই মনঃপুত নয়। নির্দিষ্ট কালের মধ্যে যুগ-বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ—

প্রথমতঃ, **খেয়াল মাফিক যুগ-বিভাগ**—ইতিহাসে যুগ পরিবর্তন হঠাৎ ঘটে না। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন যুগ শেষ হয়ে গেল এবং তারপরেই হঠাৎ আরম্ভ হ'ল মধ্যযুগ; আবার পঞ্চদশ শতকে এসে মধ্যযুগ থমকে দাঁড়াল—এরূপ ধারণা ভুল। এই যুগের পরিবর্তন এসেছে অতি ধীরে। প্রাচীন যুগের অবসানের মধ্যেই জন্ম নিয়েছে মধ্যযুগ। ঠিক এইভাবে মধ্যযুগ আধুনিক যুগে গিয়েছে মিশে। ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতের মত প্রবহমান। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়কে 'প্রাচীন', 'মধ্য', 'আধুনিক' প্রভৃতি বিশ্লেষণে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, **বিভিন্নদেশে বিভিন্ন সময়ে 'মধ্যযুগের' শুরু**—বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে একই সময়ে মধ্যযুগ সব দেশে শুরু হয়নি। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায় পশ্চিম ইউরোপে নতুন যুগ এসেছে। কিন্তু পাশাপাশি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের চিত্র অন্য ধরনের। সেখানে ঐসময়ে পুরানো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। আবার সপ্তম শতকে হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত আরবদেশের ইতিহাসে তেমন রদবদল হয়নি। চীনের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতকেও চীনে মধ্যযুগের অবসান ঘটেনি। সুতরাং বলতে পারা যায় যে সাধারণতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত

সময়কে ঐতিহাসিকেরা 'মধ্যযুগ' নামে চিহ্নিত করলেও পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। আসল কথা 'মধ্যযুগ' বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে এসেছিল।

তৃতীয়তঃ, ইতিহাসে বৈচিত্র্য—কলে প্রস্তুত সব জিনিস যেমন একই ধরনের হয় ইতিহাস কিন্তু সেরকম হয় না। ইতিহাস ও ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। ভৌগোলিক পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয় এবং তাদের চিন্তাধারা ও কর্মের মধ্যেও পার্থক্য ঘটে। বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা দেখা দেয়। কোন কোন দেশ সভ্যতায় বেশী এগিয়ে যায়; আবার কোন কোন দেশ ধীরে চলতে থাকে। তার ফলে একই সময়ে সব দেশের সমান উন্নতি হয় না এবং ইতিহাসের গতিও সর্বত্র সমান থাকে না। সুতরাং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসে এই সময়ে একই যুগ-বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগ কাকে বলে এবং কেন? ২। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের রূপান্তর কিভাবে হল? ৩। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি কি? ৪। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে কেন ভারতবর্ষে মধ্যযুগের আরম্ভ ধরা হয়? ৫। ভারত ও ইউরোপের ইতিহাসে কালগত সাদৃশ্য সম্পর্কে লেখ। ৬। নতুন যুগের সূচনা কখন হয়? ৭। কোন্ কোন্ দেশে কোন্ সময় মধ্যযুগ শুরু হয়েছে? ৮। সব দেশে একই সময়ে একই যুগ-বৈশিষ্ট্য কেন দেখা যায় না? ৯। কোন নির্দিষ্ট সময়কে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক যুগে চিহ্নিত করা উচিৎ নয় কেন?

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দাও: ১। রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে? ২। কোন্ সময়কে মধ্যযুগ নামে চিহ্নিত করা হয়? ৩। ভারতের ঐক্যশক্তি কেন বিনষ্ট

হয়েছিল ? ৪। বারবার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল কে বিধ্বস্ত করেন ? ৫। মুঘল শাসন ভারতে কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

**নীচের প্রশ্নগুলির ডানদিকে প্রদত্ত সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও।**

১। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দাসদের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা ( স্থির থাকে / উন্নতি হয় / ভেঙ্গে পড়ে )।

২। প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে ( খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে / ৩য় শতকে / ১ম শতকে )।

৩। ইউরোপে নতুন চিন্তাধারার আমদানী হল ( ত্রয়োদশ শতকে / চতুর্দশ শতকে/ পঞ্চদশ শতকে )।

৪। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন আরম্ভ হয় ( দশম শতক থেকে / একাদশ শতক থেকে / দ্বাদশ শতক থেকে )।

৫। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে ( এক বিশাল সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয় / একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয় / বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয় )।

৬। বাবর প্রথমে ছিলেন ( তুর্কীস্তানের লোক / মধ্য এশিয়ার মুঘল সর্দার / একজন আফগান )।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা

**পাঠ-সংকেত**—জার্মান উপজাতি ● হূণদের আগমন ও জার্মান উপজাতির উপর চাপ ● উপজাতিগুলির রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ ● পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ● রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শ ও রোমান আইন-কানুনের প্রভাব ● রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণকারীদের ভূমিকা ● জার্মান উপজাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন ● পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতির বসতি স্থাপন ● রোমানদের সঙ্গে জার্মান উপজাতিগুলির মিশ্রণ ● খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব।

খ্রীষ্টের জন্মের আগে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে জার্মান উপজাতির লোক বসবাস করত। খুব সম্ভবতঃ লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং উপযুক্ত পরিমাণ :ফসল ঐ অঞ্চলে না পাওয়ায় জার্মানরা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে

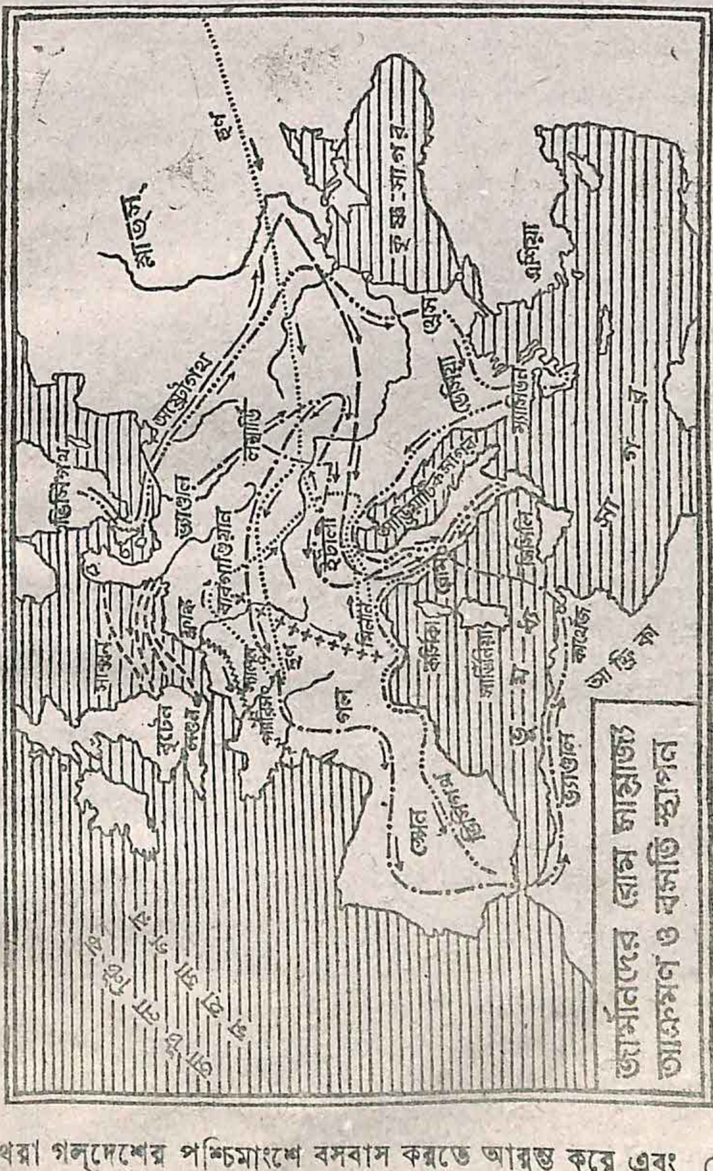
দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে। তারা ক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে উপস্থিত হল।

জার্মান উপজাতিগুলির মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ, লম্বার্ড, জুট, স্যাক্সন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্র্যাঙ্করা রাইন নদীর মোহনার কাছে বসতি স্থাপন করেছিল। আর ভ্যাণ্ডালদের বাস ছিল দানিয়ুব নদীর উত্তর তীরে। ইতিমধ্যে গথরা আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল—(১) অষ্ট্রোগথ বা পূর্বাঞ্চলীয় গথ এবং (২) ভিসিগথ বা পশ্চিমাঞ্চলীয় গথ।

**হূণদের আগমন ও জার্মান উপজাতিগুলির উপর চাপ**—অষ্ট্রোগথরা বাস করত কৃষ্ণসাগরের উত্তরে, নিষ্টার নদীর পূর্বে; আর নিম্ন দানিয়ুব অঞ্চলে নিষ্টার নদীর পশ্চিমে ছিল ভিসিগথদের বাস। মধ্য-এশিয়ার বাস করত হূণ নামে এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি। মধ্য-এশিয়া থেকে তারা ক্রমশঃ পশ্চিম ইউরোপের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হূণদের আক্রমণে অষ্ট্রোগথরা বিপর্যস্ত হয়। অষ্ট্রোগথদের দশা দেখে ভীত-ত্রস্ত ভিসিগথরা রোমান সম্রাট ভ্যালেন্‌সের কাছে রোমান সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে বসবাসের জন্য আবেদন করে।

**পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে উপজাতিগুলির প্রবেশ**—রোমান সম্রাট ভিসিগথদের আশ্রয়ের অনুমতি দিলেন বটে কিন্তু ভিসিগথদের ওপর কয়েকটি সর্ত চাপিয়ে দিলেন। এই সর্তগুলি ছিল তাদের পক্ষে খুবই অপমানজনক। তথাপি ঐ সর্ত মেনে নিয়ে তারা ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের মিত্র হিসেবে থ্রেস অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। কিন্তু রাজকর্মচারীদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে ভিসিগথরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শেষ পর্যন্ত এ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে (৩৭৮ খ্রীঃ) রোমান সৈন্যবাহিনী ভিসিগথদের কাছে হেরে যায়। সম্রাট ভ্যালেন্স এই যুদ্ধে নিহত হলেন। বেগতিক দেখে পরবর্তী রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস ভিসিগথদের দানিয়ুব নদীর দক্ষিণে প্যান্নোনিয়া ও মিসিয়াতে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করে দেন। কিন্তু থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর আবার গণ্ডগোল শুরু হ'ল। এবার ভিসিগথরা তাদের সর্দার এ্যালারিকের নেতৃত্বে রোম দখল

করে তিন দিন ধরে লুঠতরাজ করল। (৪১০ খ্রীঃ) এ্যালারিকের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে রোমানদের মিত্র হিসেবে




ভিসিগথরা গল্‌দেশের পশ্চিমাংশে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং সেখান থেকে পিরেনিজ পর্বত পার হয়ে তারা অবশেষে স্পেন দেশে বসতি স্থাপন করে।

অন্যান্য জার্মান উপজাতিরাও হূণদের তাড়া খেয়ে ৪০৬ খ্রীঃ রাইন নদী অতিক্রম ক'রে রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এদের মধ্যে বার্গাণ্ডীয় ও ভ্যাণ্ডালদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্গাণ্ডীয়রা রোণ উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। ভ্যাণ্ডালরা প্রথমে গল্‌দেশে কিছুদিন থেকে স্পেনে চলে যায়; আবার সেখান থেকে ভিসিগথদের চাপে উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন---বর্বর উপজাতিগুলির সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ করার ফলে রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সেনাপতি ওডোভাকার নাবালক সম্রাট রোমুলাস অগাষ্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করলে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

ওডোভাকার কিন্তু নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেননি। তিনি রাজমুকুট ও রাজপোষাক পাঠিয়ে দিলেন কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে পূর্ব রোমান সম্রাট জেনোর কাছে। এইভাবে জেনোর অধীনস্থ শাসকরূপে তিনি ইতালির শাসনভার গ্রহণ করলেন। তাঁর উপাধি হল প্যাট্রিসিয়ান।

**রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সত্ত্বেও রোমান আইন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অস্তিত্ব**—ইতালির ওপর দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে অনেক; সভ্যতা-সংস্কৃতিও বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; তবুও কিন্তু পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে রোমান সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেনি। শাসন-ব্যবস্থারও বিশেষ কোন হের-ফের হয়নি। রাজ্যের সর্বত্র প্রাচীন রোমান আইন বলবৎ থাকল। আগের মতই রোমের সিনেটের ওপর কনসাল নিয়োগের দায়িত্ব ন্যস্ত রইল। ধর্মীয় ব্যাপারে পোপ এবং বিশপগণের কর্তৃত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না। এমনকি ওডোভাকার রোমের ক্ষমতা দখল করায় যে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে তা রোমের জনসাধারণ বুঝতে পারেনি। তারা ভেবেছিল যে সম্রাট জেনোর অধীনে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ বুঝি আবার এক হল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও তার ঐতিহ্য লুপ্ত হয়নি। তাই পরবর্তীকালে ফ্র্যাঙ্কদের রাজা শার্লেমানকে দেওয়া হয়েছিল পবিত্র রোমান সম্রাট উপাধি।

রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণকারীদের ভূমিকা—বেশ কয়েকজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে এ্যালারিক, এটিলা ও গেইসেরিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ্যালারিক—৩৯৫ খ্রীঃ-এ রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর ভিসিগথজাতি নৃপতি পদে তাদের তরুণ নেতা এ্যালারিককে নির্বাচিত করে। এ্যালারিক গথ বাহিনী নিয়ে থ্রেস, ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করেছিলেন। এই সময়ে রোমের ভ্যাণ্ডাল সেনাপতি ষ্টিলিকো ছিলেন খুবই প্রতাপশালী। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ভিসিগথরা রোম আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে রোম সম্রাট হনোরিয়াস ৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করলেন। এবার এ্যালারিকের পক্ষে রোম আক্রমণের কোন বাধাই রইল না। দুর্বল সম্রাট হনোরিয়াস ভয় পেয়ে রোম ছেড়ে র‍্যাভেনা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। এ্যালারিক রোমানদের কাছে তাদের সমুদয় ধনরত্ন দাবী করলেন। রোমানরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল "তবে আমাদের আর কি রইল ?" এ্যালারিক উত্তর দিলেন "কেন, তোমাদের জীবন ?" রোমানরা প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে এ্যালারিকের হাত থেকে সাময়িক রক্ষা পেল।

কিন্তু এর কিছুদিন পরে আবার ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে এ্যালারিক রোম আক্রমণ করলেন। তিনদিন ধরে অবাধে চলল লুণ্ঠন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে এ্যালারিকের মৃত্যু হয় ( ৪১০ খ্রীঃ )।

এটিলা—আনুমানিক ৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এটিলা দুর্ধর্ষ হূণ জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নৃশংসতার জন্য তাঁকে বলা হ'ত 'বিধাতার অভিশাপ'। এটিলা সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন "যেখান দিয়ে আমার ঘোড়া যাবে সেখানে আর কোন ঘাস জন্মাবে না।" অর্থাৎ সব কিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এটিলা রাইন নদী অতিক্রম করে গল দেশে ( বর্তমান ফ্রান্সে) সসৈন্যে হাজির হলেন। ভীত জার্মান উপজাতিগুলি হূণ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রোমের নেতৃত্ব মেনে নিল। মার্ণ নদীর তীরে স্যালনে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল এবং এটিলা হার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু পরের বছর ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে আবার এটিলা ইতালি আক্রমণ করলেন। এবারে

রোমানরা জার্মান উপজাতিগুলির কোন সাহায্য পেল না। ফলে এ্যাকুইলিয়া, পেভিয়া, মিলান প্রভৃতি নগরীগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল; কিন্তু অরক্ষিত রোম নগরী আক্রমণ না করেই তিনি দানিয়ুব অঞ্চলে ফিরে গেলেন। জনশ্রুতি আছে যে, পোপ প্রথম লিও এটিলাকে রোম নগরী না আক্রমণ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয়।

**গেইসেরিক**—৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে গেইসেরিক ভ্যাণ্ডালদের রাজা হ'ন। তাঁরই নেতৃত্বে ভ্যাণ্ডালরা স্পেন থেকে উত্তর আফ্রিকায় উপস্থিত হল। উত্তর আফ্রিকা ছিল রোমের অধীনস্থ প্রদেশ। গেইসেরিক সেখানকার শাসককে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কার্থেজের মত গুরুত্বপূর্ণ বন্দরও তাঁর দখলে এল। ভ্যাণ্ডালদের লুঠতরাজের ফলে রোমের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট ভ্যালেন্টাইন নিহত হওয়ায় রোমে দেখা দিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। এই সুযোগে গেইসেরিক রোমে এসে হাজির হলেন সসৈন্যে। রোম মহানগরী প্রায় ধ্বংস হল এই বর্বরদের হাতে। চৌদ্দ দিন ধরে ব্যাপক লুঠতরাজ চলল। জাহাজ বোঝাই করে অসংখ্য মূর্তি, তৈজসপত্র, ধন-দৌলত তারা কার্থেজে নিয়ে গেল। ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গেইসেরিকের মৃত্যু হয়।

**জার্মানিক উপজাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন**—প্রাচীন রোমান ঐতিহাসিক তাসিতাসের লেখা 'জার্মানীয়া' গ্রন্থ থেকে জার্মান উপজাতিগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

**সামাজিক জীবন**—খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রতিটি জার্মান উপজাতি কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হ'ত এই গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর সকল সদস্যেরই একের সঙ্গে অপরের ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং সকলের আনুগত্য ছিল গোষ্ঠীর প্রতি।

রোমান সাম্রাজ্য দখলের আগে জার্মান উপজাতিগুলির স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য কোন বড় গ্রাম বা শহর ছিল না। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে এক জায়গায় বাস করত। কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোনো জমি-জমা ছিল না।

প্রতিবছর নতুন করে গোষ্ঠীর সদস্যদের জমি বিলি-বন্দোবস্ত দেওয়া হত। জার্মান সমাজে প্রথমে সকলেরই আর্থিক অবস্থা ছিল প্রায় সমান। কিন্তু কালক্রমে তাদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দেখা দেয় এবং তার ফলে জার্মান সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—অভিজাত, স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস।

জার্মানরা নারীজাতিকে সম্মানের চোখে দেখত। নারীদের স্বাধীনতাও ছিল প্রচুর। ঘরের কাজতো তারা করতই এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যোদ্ধাদের তারা উৎসাহ দিত।

যুদ্ধই ছিল জার্মানদের জীবন। সেইজন্য উপযুক্ত বয়স হলেই সকলের সামনে জার্মান যুবকের হাতে তুলে দেওয়া হ'ত বর্শা ও ঢাল। এতদিন পর্যন্ত সে ছিল পরিবারের সদস্যমাত্র, কিন্তু অস্ত্র তুলে নেওয়ার পরে সে হল সমগ্র রোমের সদস্য। জার্মান সর্দাররা পছন্দ অনুযায়ী বীর যোদ্ধা নিয়ে দল গড়ত। যোদ্ধদলের সম্পূর্ণ আনুগত্য ছিল সর্দারের প্রতি। সর্দার তাদের জোগাত অন্ন, বস্ত্র ও অস্ত্র। প্রতিদানে তারা সর্দারের পক্ষে মরণ-পণ লড়াইয়ের শপথ গ্রহণ করত। জার্মান সমাজে যোদ্ধাদের মধ্যে পারস্পরিক এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে বলা হত কমিটেটাস।

**রাজনৈতিক সংগঠন**—জার্মান উপজাতিগুলির রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে সবচেয়ে নীচে ছিল গ্রাম্য সমাজ। গ্রামের উপরে ছিল 'হানড্রেড'। কয়েকটি হানড্রেডের সমষ্টিকে বলা হত 'ক্যান্টন' বা গাউ। আবার কতকগুলি ক্যান্টন নিয়ে গঠিত হ'ত একটি রাজ্য। রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ সংস্থা ছিল গণপরিষদ। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেই প্রত্যেকে গণপরিষদের সদস্য হওয়ার অধিকার পেত। যেসব বিষয়গুলির সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বার্থ জড়িত তা সবই আলোচিত হ'ত গণপরিষদে। গণপরিষদই রাজা, সেনাপতি প্রভৃতি মনোনীত করত। প্রথমে রাজার ক্ষমতা ছিল সীমিত। এমনকি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে সব জার্মান উপজাতির মধ্যে রাজতন্ত্রও প্রচলিত ছিল না। কিন্তু যখন জার্মান উপজাতিগুলি দলে দলে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাত্রা করল তখন প্রয়োজনের তাগিদে অনেক দল গেল একসঙ্গে মিশে। সেই সময় থেকেই গণপরিষদের গুরুত্ব অনেক কমে গেল এবং বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলেই চাইল শক্তিশালী রাজতন্ত্র।

ধর্ম—খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের আগে জার্মান-উপজাতিগুলি বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। দেব-দেবীদের জার্মানরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক বলে মনে করত। ইংরাজীতে সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম নিশ্চয়ই তোমরা জান। বেশ কয়েকটি দিনের নামকরণ হয়েছে জার্মান দেব-দেবীর নাম থেকে। জার্মানদের অন্যতম প্রধান দেবতা ছিলেন থর। তাঁর নাম থেকে হয়েছে থার্সডে। তিনি বজ্রের দেবতা। অন্যায়কারীকে শাস্তি দিয়ে তিনি পৃথিবী রক্ষা করেন। আরেকজন দেবতা হলেন ওডেন। তাঁর নাম থেকে হয়েছে ওয়েড্‌নেস্ ডে। ওডেন সকল দেবতার পিতা। তিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। কবিতালেখা, অক্ষরের ব্যবহার—ওডেনই মানুষকে শিখিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি বলহল্লার অধিপতি। জার্মানরা যুদ্ধপ্রিয় জাতি। যুদ্ধে মৃত্যু ছিল তাদের পরম কাম্য। তারা বিশ্বাস করত যে যুদ্ধে কোন সৈনিক মৃত্যু বরণ করলে ওডেনের দূতীরা মৃত সৈনিককে বলহল্লাতে নিয়ে যায়। সেখানে তারা চিরশান্তি ও আনন্দ লাভ করে। ওডেনের স্ত্রী ফ্রিগ্‌গা (যাঁর নাম থেকে ফ্রাইডে'র উৎপত্তি) ছিলেন আকাশের দেবী। তাঁর কৃপায় মানুষের ঘর-গৃহস্থালী টিকে থাকে।

জার্মান দেবতারা কিন্তু অমর ছিলেন না। মানুষের ন্যায় তাঁদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। তবে মানুষের তুলনায় তাঁদের আকৃতি ও আয়ু ছিল দীর্ঘ এবং ক্ষমতাও ছিল বেশী।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপজাতির বসতি স্থাপন—পঞ্চম শতকের শেষভাগে জার্মান উপজাতিগুলির চলাফেরার দিন শেষ হ'ল। তারা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করে গড়ে তুলল পাকাপাকি বসতি। ভ্যাণ্ডালরা আফ্রিকার উত্তরাংশে বসবাস আরম্ভ করল। স্পেন ও দক্ষিণ গল হ'ল ভিসিগথদের বাসস্থান। ৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে থিওডোরিক রোম জয় করলে ইতালিতে অষ্ট্রোগথরা বসতি স্থাপন করল। রোণ উপত্যকা হ'ল বার্গাণ্ডীয়দের বাসস্থান। উত্তর ও মধ্য গলদেশে ফ্রাঙ্ক জাতি ও ব্রিটেনে জুট, এ্যাংলো-স্যাকসন প্রভৃতি জাতি রাজ্য স্থাপন করে।

রোমানদের সঙ্গে জার্মান উপজাতিগুলির সংমিশ্রণ—রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করায় জার্মান-উপজাতিগুলি তাদের

স্বাতন্ত্র্য খুব বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারল না। পাশাপাশি বসবাস করার ফলে কালক্রমে তারা রোমান সংস্কৃতি গ্রহণ করল এবং ধীরে ধীরে রোমান জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গেল। তাদের আর পৃথক কোন অস্তিত্ব রইল না। এইভাবে জার্মান উপজাতিগুলির সভ্যতার সঙ্গে রোমান সভ্যতার সংমিশ্রণে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি রচিত হল।

বাসিন্দাদের ওপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব—রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়ছিল। রোমানরা খ্রীষ্টধর্ম আগেই গ্রহণ করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যারা বসবাস শুরু করেছিল তারাও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব থেকে খুব বেশীদিন দূরে থাকতে পারল না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে বর্বর জার্মান উপজাতিগুলি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। প্রথমে জার্মান উপজাতিগুলি ছিল যেমন নৃশংস, তেমনি অত্যাচারী। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের উদারতা, দয়া, শান্তি ও ভালবাসা তাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলল। তারা তাদের হিংস্রতা ভুলে ক্রমশঃ সভ্য সংযত জীবন যাপন করতে আরম্ভ করল।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

**রচনামূলক প্রশ্ন**

১। এ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ ( ৩৭৮ খ্রীঃ ) কার কার মধ্যে হয়েছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি? ওডোভাকার কে? তার সম্পর্কে যাহা জান লেখ। ২। ভিসিগথ নেতা এ্যালারিকের রোম আক্রমণ সম্পর্কে লেখ। ৩। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরেও রোমান আইন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য কিভাবে বলবৎ ছিল? ৪। জার্মান উপজাতির সর্দাররা কিভাবে দল গড়ত? যোদ্ধারা কি ধরনের শপথ গ্রহণ করত? ৫। জার্মান উপজাতিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন কি ছিল? তার কার্যাবলী বর্ণনা কর। ৬। জার্মান উপজাতিদের সমাজে নারীদের অবস্থা কিরূপ ছিল? ৭। জার্মান উপজাতিদের প্রধান দেবতার নাম কি? এই দেবতা সম্পর্কে জার্মানদের ধারণা কি ছিল? ৮। 'বলহল্লা' কি? সেখানে কারা যায় এবং কিভাবে থাকে? জার্মান উপজাতিগুলির খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফল কি হয়েছিল?

**এক কথায় উত্তর দাও:** ১। খ্রীষ্টের জন্মের আগে জার্মান উপজাতির লোক কোথায় বসবাস করত? ২। গথ জাতির দুটি শাখার নাম লিখ। ৩। হূণ জাতির আদি বাসস্থান কোথায়? ৪। সম্রাট ভ্যালেন্স কোন্ যুদ্ধে নিহত হন? ৫।

থিয়োডোসিয়াস কি করেছিলেন ? ৬। রোমুলাস অগাষ্টাসকে কে পদচ্যুত করেন ? ৭। এ্যালারিক যখন রোম আক্রমণ করেন তখন রোমের সম্রাট কে ছিলেন এবং তিনি কি করেছিলেন ? ৮। ইতালির শাসনভার গ্রহণ করার পর ওডোভাকার কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ? ৯। 'বিধাতার অভিশাপ' কাকে বলা হত ? ১০। ব্রিটেনে কারা বসতি স্থাপন করেছিল ? ১১। 'জার্মানীয়া' গ্রন্থের লেখকের নাম কি ? ১২। জার্মান উপজাতিদের কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিকে কি বলা হত ? ১৩। জার্মানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম কি ? ১৪। 'ফ্রাইডে' কার নাম থেকে হয়েছে ?

## বিষয়মুখী প্রশ্ন

**নীচের প্রশ্নগুলির ডানদিকে প্রদত্ত সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও।**

১। হূনদের আক্রমণে অষ্ট্রোগথরা বিপর্যস্ত হয় ( ৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে / ৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে / ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে )।

২। হূণদের ভয়ে ভীত হয়ে ভিসিগথরা রোমান সাম্রাজ্যে বসবাসের জন্য আবেদন জানায় সম্রাট ( ভ্যালেন্সের কাছে / থিয়োডোসিয়াসের কাছে / হনোরিয়াসের কাছে )।

৩। জেনোর কাছে রাজমুকুট ও রাজ পোশাক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ( রোমুলাস অগাষ্টাস / ওডোভাকার / গেইসেরিক )।

৪। এ্যালারিকের মৃত্যু হয় ( ৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে / ৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে / ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে )।

৫। এটিলার সঙ্গে রোমান ও জার্মানিক উপজাতিগুলির যুদ্ধ হয় ( রোমে / সাঁলনে/ থ্রেসে )।

৬। এটিলাকে রোম আক্রমণ না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন ( পোপ প্রথম লিও / ওডোভাকার / হনোরিয়াস )।

৭। 'যেখান দিয়ে আমার ঘোড়া যাবে সেখানে আর কোন ঘাস জন্মাবে না'—এই উক্তি করেছিলেন ( এ্যালারিক / এটিলা / গেইসেরিক )।

৮। ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডালদের রাজা হন ( গেইসেরিক / এ্যালারিক / ষ্টিলিকো )।

৯। ৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রোম জয় করলেন ( থিওডোরিক / এ্যালারিক / এটিলা )।

১০। জার্মান উপজাতিদের সকল দেবতার পিতার নাম ( থর / ফ্রিগগা / ওডেন )।

১১। কমিটেটাস হল ( বিবাহ অনুষ্ঠান / শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান / একপ্রকার যুদ্ধ )।

১২। জার্মান উপজাতিদের রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ছিল ( হানড্রেড / গাউ / গণপরিষদ )।

**শূন্যস্থান পূর্ণ কর :** (১) রোমান সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ভিসিগথরা—অতিক্রম করে—রোমান সাম্রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। (২) এ্যালারিক গথ বাহিনী নিয়ে—

—— বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করেছিলেন। (২) ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট — নিহত হওয়ার রোমে দেখা দিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। (৩) —রোণ উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল। (৫) জনশ্রুতি আছে —— এটিলাকে রোমনগরী না আক্রমণ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। (৬) 'জার্মানিয়া' গ্রন্থের লেখকের নাম ——। (৭) রোম সাম্রাজ্য দখলের আগে জার্মান উপজাতিগুলির স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য —বা— ছিল না। (৮) কতকগুলি ক্যান্টন নিয়ে গঠিত হত —। (৯) ফ্রাঙ্ক জাতি রাজ্য স্থাপন করে ——। (১০) ওডেনের স্ত্রী — ছিলেন ——।

ভুল বাক্যগুলিকে ঠিক করে লেখ : (১) অস্ট্রোগথরা কৃষ্ণসাগরের পূর্ব দিকে বাস করত। (২) সম্রাট ভ্যালেন্স ভিসিগথদের দানিয়ুব নদীর দক্ষিণে প্যান্নোনিয়া ও মিসিয়াতে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করে দেন। (৩) ভ্যাণ্ডালরা ভিসিগথদের চাপে ইতালিতে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে। (৪) ৪১২ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যু হয়েছিল। (৫) এটিলা কার্থেজের মত গুরুত্বপূর্ণ বন্দরও দখল করে নিয়েছিলেন। (৬) হানড্রেডের সমষ্টিকে বলা হত রাজ্য। (৭) জার্মান দেবতারা অমর ছিলেন। (৮) খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বর্বর জার্মান উপজাতিগুলি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

---

## তৃতীয় অধ্যায়

# ইউরোপের তথাকথিত 'অন্ধকারময় যুগ'

পাঠ-সংকেত—অন্ধকারময় যুগ কাকে বলে ● অন্ধকারময় যুগ কথাটির যৌক্তিকতা ● মঠকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ● বর্বর জাতিগুলির উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব।

চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক অন্ধকারের যুগ নয়—প্রাচীন যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে রোমানরা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তাই সেই আমলে রোম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বর্বরদের বারবার আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস হল উন্নত রোমান সভ্যতা। হূণ, গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি জাতিগুলি ছিল অসভ্য বর্বর। শিক্ষা-দীক্ষা বলতে তাদের ছিল না প্রায়

কিছুই। তাদের পক্ষে আগের মত উন্নতমানের সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। শহরগুলি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ-ব্যবস্থা কিছু ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের মানুষ বিদ্যাচর্চা ছেড়ে দিয়েছিল। এরূপ অবস্থা চলে প্রায় চার'শ বছর কাল—খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতক থেকে সপ্তম শতক। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে নেমে এসেছিল অজ্ঞানতার অন্ধকার। সেইজন্য অনেকে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৭ম শতক পর্যন্ত সময়ে ইউরোপের ইতিহাসকে 'অন্ধকারময় যুগ' আখ্যা দেন।

বর্তমানকালের ঐতিহাসিকগণ কিন্তু এই মত পোষণ করেন না। তাঁদের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই চারশ বছরের ইউরোপের ইতিহাসকে 'অন্ধকারময় যুগ' বলা চলে না।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ ছাড়াও সেকালে খ্রীষ্টান সন্নাসীরা মঠে থাকতেন। এই মঠগুলিকে তারা বিদ্যা-চর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই সভ্যতার দীপ নিভে যায়নি। ক্যাসিডোরাস, বিথিয়াস, ইসিদোর প্রভৃতি খ্রীষ্টান সন্নাসীগণ ছিলেন সেই আমলের জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁরা ভেবেছিলেন যে হয়তো বা বর্বর জাতিগুলির আক্রমণে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুপ্ত হতে পারে। যাতে তা না হয় তার জন্য প্রায় প্রতিটি মঠে গড়ে উঠল গ্রন্থাগার। এই সব গ্রন্থাগারে প্রাচীন পুঁথি সযত্নে সংরক্ষিত হত। বহু মূল্যবান প্রাচীন পুঁথির নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা বহু ধৈর্য ধরে সেই সব পুঁথি নকল করে রাখতেন। এইভাবে তাঁরা প্রাচীন সভ্যতার ধারাটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

মঠ-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা—প্রতিটি চার্চে লাতিন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। দোনেতাসের লেখা লাতিন ভাষার ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, সাহিত্য অবশ্য-পাঠ্য ছিল। লাতিন ভাষা চর্চার ফলে প্রাচীন রোমান সভ্যতার ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এই যুগের একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন বিথিয়াস। তিনি গ্রীক পণ্ডিত আরিস্তোতলের তর্কশাস্ত্রের কিছু অংশ লাতিনে অনুবাদ করেছিলেন।

অঙ্ক, জ্যামিতি, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অবশ্য দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 'কনসোলেশন্ অফ্ ফিলজফি' রচনা ক'রে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থের কিছু অংশ গদ্যে ও কিছু অংশ পদ্যে রচিত এবং ভাষাও খুব সহজ সরল। এতে তিনি মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে কালের ইউরোপে বিশ্বাসের এই দর্শনশাস্ত্রীয় গ্রন্থটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেভিলের বিশপ ইসিদোর 'বিশ্বকোষ' রচনা করেছিলেন। এই বিশাল গ্রন্থে ঈশ্বর, দেবদূত, মানুষ, রাজ্য, ভাষা, কলাবিদ্যা, কল্পিত দৈত্য, কৃষি, উদ্ভিদ-বিদ্যা, জাহাজ তৈরীর উপকরণ, পোশাক, খাদ্য, পানীয়, আসবাবপত্র প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এতে অনেক আজগুবি গল্পের বর্ণনা রয়েছে তবু এই গ্রন্থ অতীত কালের বহু তথ্য জানতে সাহায্য করে। পোঁইতিয়ারের বিশপ ভেনানসিয়াস্ ফরচুনেটাস ছিলেন একজন কবি। লাতিন ভাষায় তাঁর রচিত স্তোত্রগুলি সুললিত ছন্দে রচিত। ষষ্ঠ শতকের আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ তুরস্-এর বিশপ গ্রেগরী রচিত 'ফ্রাঙ্কদের ইতিহাস'। ফ্রাঙ্কদের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। সপ্তম শতকে বিডি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মত প্রতিভাধর পণ্ডিত সেই সময়ে ইউরোপে আর কেউ ছিল না। ছন্দ, অলঙ্কার, বানান-পদ্ধতি, ইতিহাস এবং ভৌতজগৎ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সারগর্ভ নিবন্ধ রচনা করেছেন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আগে ও পরের সময় অনুসারে বর্তমানে সর্বত্রই ইতিহাসের সন, তারিখ নির্ণয় করা হয়। বিডিই তাঁর রচিত ইতিহাসে প্রথম এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর 'বাইবেলের টীকাভাষ্য' ও 'ইংলণ্ডের চার্চের ইতিহাসে'র জন্য তিনি বেশী খ্যাতি অর্জন করেছেন।

গ্রন্থ ছাড়া প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে সেগুলি নকল করা—সন্ন্যাসীদের ধর্ম পালনের একটি অন্যতম বলে বিবেচিত হত। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে বহু অমূল্য প্রাচীন পুঁথি চিরতরে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।

এই যুগে আয়ার্ল্যাণ্ড সংস্কৃতি চর্চার দিক থেকে বেশ এগিয়ে যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডে দেশীয় ভাষায় বহু গাথা রচিত হয়েছিল। সেখানে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রসার লাভ করলে আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা লাতিন-গ্রীক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়। প্রচলিত আইরিশ ভাষার উপর গ্রীক ও লাতিন ভাষার প্রভাব পড়ে এবং উভয় ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে নতুন ভাষা। এই ভাষায় বহু সাহিত্য রচিত হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের মঠগুলি ছিল এই নতুন আইরিশ ভাষা-চর্চার অন্যতম কেন্দ্র।

বলা বাহুল্য যে, বর্বর জাতিভুক্ত রাজাদের সাহায্য ও সমর্থন না পেলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টান চার্চের পক্ষে নিভৃতে বিদ্যাচর্চা করা সম্ভব হ'ত না। সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকরা শিক্ষিত ছিল না ঠিকই কিন্তু তবু তারা শিক্ষাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা জোগাত সন্ন্যাসীদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অন্ন ও বস্ত্র। সুতরাং মধ্যযুগের সভ্যতাকে সজীব রাখতে পরোক্ষে এরাও সাহায্য করেছে।

**বর্বর জাতিগুলির ওপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব**—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ ছড়িয়ে পড়েন। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে কোলামবানের নেতৃত্বে একদল মিশনারী প্রথম স্কটল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়। ৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আয়োনা দ্বীপে একটি মঠ স্থাপিত হয়। তাঁদের প্রচারে উৎসাহিত হয়ে দলে দলে লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। কোলামবান্ ও তাঁর সহচরগণ গল, বার্গাণ্ডি ও ইতালিতেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। উইলফ্রেড, উইলিব্রড, বোনিফেস প্রভৃতি খ্রীষ্টান মিশনারীগণের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই জার্মানীর সর্বত্র মঠ গড়ে ওঠে এবং জনসাধারণও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইংল্যাণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম এই সময়ে প্রচারিত হয়।

আগে বর্বর জাতিগুলি ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত ও হিংস্র। কথায় কথায় তারা একে অপরের রক্তপাত ঘটাত। এক গোষ্ঠীর লোক অপর গোষ্ঠীর কাউকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা সেই হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে থামত না। মদ্যপান তাদের মধ্যে কোন অপরাধ বলে গণ্য করা হ'ত না। এককথায় বলা চলে পশ্চিম ইউরোপে জাপান এবং অন্যান্য উপজাতি

গুলি বর্বর ও আদিম জীবন যাপন করত। খ্রীষ্টান ধর্ম তাদের শেখায় ক্ষমা, ঔদার্য, প্রেম, দয়া প্রভৃতি মহৎ গুণ। এই সদ্‌গুণগুলি পালন করলে যীশুর করুণা লাভ করা যায়। অপরপক্ষে ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। সেই মানুষকে ঈশ্বর কখনও ক্ষমা করেন না। ধর্ম প্রচারকগণ ব্যক্তিগত প্রায়শ্চিত্ত ও অনুশোচনার ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। পুরোহিতের কাছে অপরাধী পাপ স্বীকার না করলে তার পাপ থেকে মুক্তি নেই। ঈশ্বরের নিকটে মানুষের পৌঁছানোর পথের নির্দেশ একমাত্র পুরোহিতগণই দিতে পারেন। এইভাবে যাজকগণের ধর্মপ্রচার বর্বর উপজাতিগুলির মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগরিত করে এবং তাদের চিন্তাধারায় ও কাজে আসে বিরাট পরিবর্তন। ক্রমশঃ তারা সুসভ্য হয়ে ওঠে।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। চতুর্থ শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসকে 'অন্ধকারময় যুগ' কেন বলা হত? এইরূপ বলা কতখানি যুক্তিসঙ্গত? ২। 'অন্ধকারময় যুগে' মঠগুলি কি উপায়ে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? ৩। বিথিয়াসের প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা কর। ৪। 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে কি কি বিষয় সম্পর্কে লিখিত হয়েছিল? ৫। বিডির খ্যাতি অর্জনের কারণ কি? ৬। আয়ার্ল্যাণ্ডের সংস্কৃতি সম্পর্কে যা জান লেখ। ৭। কোলামবানের ধর্মপ্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ। ৮। বর্বর জাতিদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলাফল বিবৃত কর।

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

**এক কথায় উত্তর দাও:** (১) প্রতিটি চার্চে কি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত? (২) দোনেতাসের কোন্ কোন্ বিষয়ে লেখা সে যুগে অবশ্য পাঠ্য ছিল? (৩) গ্রীক্ পণ্ডিত আরিস্তোতলের তর্কশাস্ত্রের কিছু অংশ কে লাতিনে অনুবাদ করেছিলেন? (৪) বিশ্বকোষ কার রচনা? (৫) 'ইংলণ্ডের চার্চের ইতিহাস' গ্রন্থটির লেখকের নাম কি? (৬) বিডি বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কি লেখার জন্য? (৭) প্রথম স্কটল্যাণ্ডে খ্রীষ্টান ধর্ম কে প্রচার করেন? (৮) জার্মানীতে প্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রচার

করেছিলেন যাঁরা তাদের একজনের নাম লেখ। (৯) খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ কিসের ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন ?

**ডানদিকে প্রদত্ত সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও :**

(১) 'কনসোলেশান্ অফ্ ফিলজফি' গ্রন্থটি লিখেছেন ( বিথিয়াস / বিডি / দোনেতাস )।

(২) পোইতিয়ারের বিশপ ভেনান্‌সিয়াস ফরচুনেটাস ছিলেন ( একজন শিল্পী / একজন কবি / একজন অভিনেতা )।

(৩) সন্ন্যাসীদের কাছে ধর্মপালনের অন্যতম অঙ্গ বলে বিবেচিত হত ( জপ করা / গ্রন্থ পাঠ করা / পুঁথি নকল করা )।

(৪) ৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি মঠ স্থাপিত হয় ( ইংলণ্ডে / আয়োনা দ্বীপে / ফ্রান্সে )।

(৫) কোলামবান ও তাঁর সহচরগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন ( রাশিয়ায় / ইংলণ্ডে / বার্গাণ্ডিতে )।

**শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(১) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী —শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করে। (২) — ফ্রাঙ্কদের ইতিহাস রচনা করেন। (৩) বাইবেলের টীকাভাষ্য লিখেছেন —। (৪) কোলামবানের নেতৃত্বে একদল মিশনারী প্রথম — উপস্থিত হয়। (৫) — খ্রীষ্টাব্দে আয়োনা দ্বীপে একটি মঠ স্থাপিত হয়।

---

## চতুর্থ অধ্যায়

# বাইজেণ্টাইন সভ্যতা

**পাঠ-সংকেত**—কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা ● বাইজেন্টাইনে খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতি ● সম্রাট জাস্টিনিয়ন ● ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা ● জাষ্টিনিয়ন বিধি ও তার গুরুত্ব ● শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা ● ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বাইজেন্টিয়াম ● সংস্কৃতি সংরক্ষণের কেন্দ্র বাইজেন্টিয়াম।

**কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা**—পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু অংশ জুড়ে ছিল রোমান সাম্রাজ্য। রাজধানী রোম থেকে এত বিরাট সাম্রাজ্যের সবদিকে সমান নজর দিতে রোমান সম্রাটরা পারতেন না। এ ছাড়াও বর্বর জাতিগুলির আক্রমণে যে কোন সময়ে রোম আক্রান্ত হওয়ার

সম্ভাবনা ছিল। তাই রোম থেকে দূরে কোথাও দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বসফোরাস প্রণালী যেখানে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশকে ভাগ করেছে সেখানে বাইজেন্টিয়াম নামে গ্রাকদের একটি উপনিবেশ ছিল। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন্ সেখানে নতুন দ্বিতীয় রাজধানী পত্তন করলেন। সম্রাটের নামানুসারে এই রাজধানীর নাম হল কনস্টান্টিনোপল বা কনস্টান্টাইনের নগরী ( বর্তমান ইস্তাম্বুল )।

কনস্টান্টিনোপলে বহু গ্রীক পণ্ডিত বাস করতেন। তাই এই নগরী গ্রীক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। কনস্টান্টিনোপলের আগের নাম ছিল বাইজেন্টিয়াম। সেই নামানুসারে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে বলা হয় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। বর্বর জাতিগুলির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। বল্কান উপদ্বীপ, এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি স্থান ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।


সম্রাট কনস্টান্টাইন

বাইজেন্টাইনে খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতি—যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রোমে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে রোমান সম্রাটগণ খ্রীষ্টানদের ওপর যথেচ্ছ নির্যাতন করতেন। এর জন্য খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পথে বেশ বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা স্বল্প হলেও তাদের ধর্মীয় সংগঠন চার্চ ছিল খুবই শক্তিশালী। সম্রাট ডাইওক্লিটিয়ান সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও খ্রীষ্টানধর্মকে উচ্ছেদ করতে পারেননি। কনস্টানটাইন ছিলেন খ্রীষ্টানদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। ৩১২ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সেন্‌টিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় খ্রীষ্টানগণ কনস্টান্টাইনকে সাহায্য করেছিল। ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের

দুইটি অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। উভয় অংশের জনসাধারণের ধর্ম যদি এক হয় তবে ঐক্যস্থাপনের পক্ষে অনেক সুবিধা। আর এই দিক থেকে তিনি ভেবে দেখলেন যে খ্রীষ্টধর্ম সবচেয়ে উপযুক্ত। এইসব কারণে ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পূর্বে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। ফলে রাজার ধর্ম হিসেবে খ্রীষ্টান ধর্মের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল এবং বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে এই ধর্ম প্রসারিত হ'ল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের সর্বোচ্চ যাজক ছিলেন পোপ। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও কনস্টাণ্টাইন একজন সর্বোচ্চ ধর্মীয় যাজক নিয়োগ করলেন। তাঁকে বলা হল প্যাট্রিয়ার্ক।

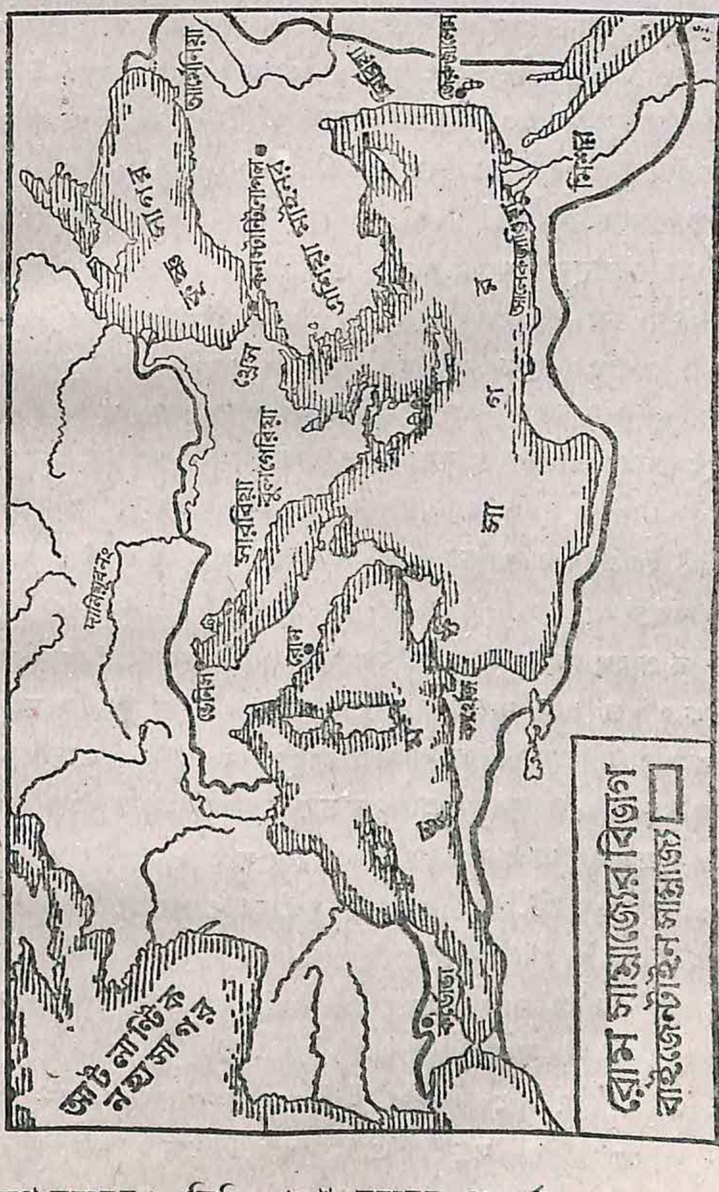
**সম্রাট জাস্টিনিয়ন**—কনস্টাণ্টাইনের পরে বাইজেণ্টাইনের উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ন। তিনি দীর্ঘ ৩৮ বৎসর কাল (৫২৭—৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এক সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে সব প্রদেশগুলি ছিল সেগুলি তিনি জয় করার চেষ্টা করেছিলেন; সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করেছিলেন এবং রাজধানীর শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখতে হলে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।



সম্রাট জাস্টিনিয়ন

**ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনে জাস্টিনিয়নের প্রচেষ্টা**—পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য তখন সম্পূর্ণ বর্বর উপজাতিদের দখলে। এই অবস্থায় জাস্টিনিয়ন তাঁর নেতৃত্ব রোমের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার সংকল্প করলেন।

উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডালরা বসতি স্থাপন করেছিল। সিংহাসন নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। সেই সুযোগে সম্রাট জাস্টিনিয়ন আফ্রিকায়




হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে তিনিই হলেন আফ্রিকার প্রকৃত শাসক। ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর

সেনাপতি বেলেসেরিয়াস আফ্রিকা আক্রমণ করলেন। ভ্যাণ্ডালগণ বেলিসেরিয়াসের আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হ'ল এবং এক বছরের মধ্যেই উত্তর আফ্রিকায় জাস্টিনিয়ন্ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর সিসিলি থেকে বেলেসেরিয়াস অষ্ট্রোগথদের তাড়িয়ে দিলেন। বেলেসেরিয়াস ইতালি অভিযান করলেন এবং ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি জাস্টিনিয়নের দখলে আসে। বেলেসেরিয়াসের শৌর্যে ও চাতুর্যে ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পো নদীর দক্ষিণস্থ সমগ্র অঞ্চলে জাস্টিনিয়নের অধিকার স্থাপিত হয় এবং অধিকৃত অঞ্চলে রোমান আইন-কানুন ও শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। তবে অষ্ট্রোগথদের সঙ্গে জাস্টিনিয়নের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলে। ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রোগথদের শেষ রাজা তোতিলা যুদ্ধে নিহত হলে অষ্ট্রোগথ শক্তি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। ইতালি সম্পূর্ণ জয় করার আগেই জাস্টিনিয়ন ভিসিগথদের কাছ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব স্পেন এবং ভ্যাণ্ডালদের কাছ থেকে সার্দিনিয়া, কর্সিকা এবং বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ জয় করে নিয়েছিলেন। বর্বর উপজাতিদের পরাজিত করে জাস্টিনিয়ন পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পুনরায় তাঁর অধীনে একত্রিত করলেন।

বিভিন্ন প্রদেশ জয় করেই জাস্টিনিয়ন ক্ষান্ত রইলেন না। অধিকৃত অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য তিনি কূটনীতি প্রয়োগ করলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তের ওপারে লম্বার্ড, শ্লাভ, বুলগার, আরব এবং মোঙ্গোল প্রভৃতি বর্বর উপজাতি বাস করত। তারা প্রায়ই সাম্রাজ্যে ঢুকে উৎপাত করত। তাই কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে তিনি তাদের বসে আনার চেষ্টা করলেন। সীমান্ত রক্ষার জন্য জাস্টিনিয়ন সীমান্তে বহু দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। একমাত্র সীমান্তেই প্রায় ছ'শ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু তবুও তাঁর নীতি ছিল বর্বর উপজাতিগুলির সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করা। এই উপজাতিদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিনি অকাতরে এদের উৎকোচ, অর্থ, উপাধি বিতরণ করতেন। জাস্টিনিয়ন ভেবেছিলেন যে কনস্টান্টিনোপলের রাজদরবারের ঐশ্বর্য দেখলে বর্বর উপজাতির সর্দাররা সম্রাটের প্রতি বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়বে এবং রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণের সাহস পাবে না। এই কারণে উপজাতি সর্দারদের কনস্টান্টিনোপলে আমন্ত্রণ জানাতেন। আবার কূটনৈতিক

কৌশলে উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিতেন। যদি তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তবে তারা আর বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করবে না। কিন্তু জাস্টিনিয়নের এই প্রচেষ্টা সব সময় সফল হয়নি। একদিকে অপরিমিত অর্থ ব্যয়ের জন্য রাজকোষ শূন্য হয়েছিল; অপরদিকে রোমান সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য বর্বর উপজাতিগুলিকে সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করেছিল। জাস্টিনিয়নের রাজত্বকালেই শ্লাভজাতির বারবার আক্রমণে বলকান অঞ্চল বিধ্বস্ত হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর শ্লাভরা সেখানে বসতি স্থাপন করে।

রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য জাস্টিনিয়ন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাস্তা-ঘাট, সেতু, জলাধার, নাট্যশালা, রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে বহু মনোরম সৌধ নির্মিত হয়েছিল। তার আমলে কনস্টান্টিনোপল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

জাস্টিনিয়ন বুঝতে পেরেছিলেন রোমান সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেইজন্য সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের অধীনে আনয়ন করলেন। তার ফলে রাজার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল।

জাস্টিনিয়ন মনে করতেন যে রাজা সব কিছুরই ওপরে। ধর্মও সম্পূর্ণরূপে তাঁরই অধীন। কনস্টান্টাইনের সময় থেকেই পূর্ব রোমান সম্রাটগণ ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেক বেশী প্রভাব খাটাতেন। জাস্টিনিয়ন এই বিষয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি নিজে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনো করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ধর্ম নিয়ে কোন মতভেদ হলে সে সম্পর্কে তিনিই চূড়ান্ত কথা বলার অধিকারী। তাঁর মত যাতে যাজক ও জনসাধারণ সকলেই মেনে নেয় তার জন্য বলপ্রয়োগ করতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। এছাড়াও জাস্টিনিয়ন যাজকগণকে বিভিন্ন পদে নিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এককথায় বলা চলে যে, গ্রীক চার্চ সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের অধীনস্থ হয়েছিল। রাজতন্ত্রের মহিমা ও গৌরব বৃদ্ধি করতে জাস্টিনিয়ন রাষ্ট্র ও ধর্ম—উভয়ক্ষেত্রেই সর্বেসর্বা হয়েছিলেন।

**জাস্টিনিয়ন বিধি**—আইন-প্রণেতা হিসেবে জাস্টিনিয়ন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস রোমান আইনের সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু তারপরে অনেক বছর কেটে গিয়েছে এবং পরিস্থিতিরও ঘটেছে বহু পরিবর্তন। তাই নতুন করে আইন সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই আইন প্রচলিত ছিল না ; এবং প্রচলিত আইনগুলির মধ্যেও অনেকক্ষেত্রে একের সঙ্গে অপরের বিরোধ ছিল। জাস্টিনিয়নের উদ্দেশ্য ছিল এইসব বিরোধ দূর করে সারা সাম্রাজ্যে একই আইন প্রয়োগ করা। আইন সংস্কার করে সেগুলি সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে দশজন আইনজ্ঞ নিয়োগ করলেন। এই সব আইনজ্ঞদের মধ্যে ট্রিবোনিয়ানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রোমান সম্রাট হাড্রিয়ানের কাল থেকে জাস্টিনিয়নের সময় পর্যন্ত রচিত বিধিগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ সরল ভাষায় 'কোডেক্স জাস্টিনিয়েনাস্' বা 'জাস্টিনিয়ন বিধি' এক বছরের মধ্যেই প্রকাশ করা হ'ল। রোমান আইনশাস্ত্র ছিল বিখ্যাত রোমান বিচারক ও আইনবিদ্‌গণের অভিমত ও সিদ্ধান্তের সঙ্কলন। এই আইন শাস্ত্রের বহু অংশই ছিল অপ্রয়োজনীয়। নতুনভাবে সংক্ষিপ্ত ও সহজাকারে তাই আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করার দায়িত্ব ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একদল আইনবিদের ওপর অর্পন করলেন। আইনবিদদের নেতা ছিলেন ট্রিবোনিয়ান। তিন বছরের মধ্যেই তাঁরা এই দুরূহ কাজে সফল হলেন। নব আইন শাস্ত্রের নাম দেওয়া হল ডাইজেস্টা বা পেন্‌ডেক্‌টা। জাস্টিনিয়নের উদ্যোগে রচিত এই আইনগ্রন্থগুলি ছিল জটিল ও বিরাট। ছাত্রদের পক্ষে তাই এগুলি আয়ত্তে আনা ছিল খুবই কঠিন। তাই তাদের জন্য আরও সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে লেখা হল একটি আইনগ্রন্থ যার নাম ইনষ্টিটিউট্‌স্। ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'জাস্টিনিয়ন্ বিধি'র চূড়ান্তরূপ দেওয়া হয়েছিল। জাস্টিনিয়ন নিজে যে সব বিধি প্রণয়ন করেছিলেন সেগুলির সঙ্কলনকে বলা হল 'নভেল্‌স'। জাস্টিনিয়নের সময়ের এইসব বিধি ও বিধান সম্পর্কিত গ্রন্থ 'করাপস্ জুরিস সিভিলিস্' বা 'আইনের সমগ্র সঙ্কলন' নামে সাধারণতঃ পরিচিত।

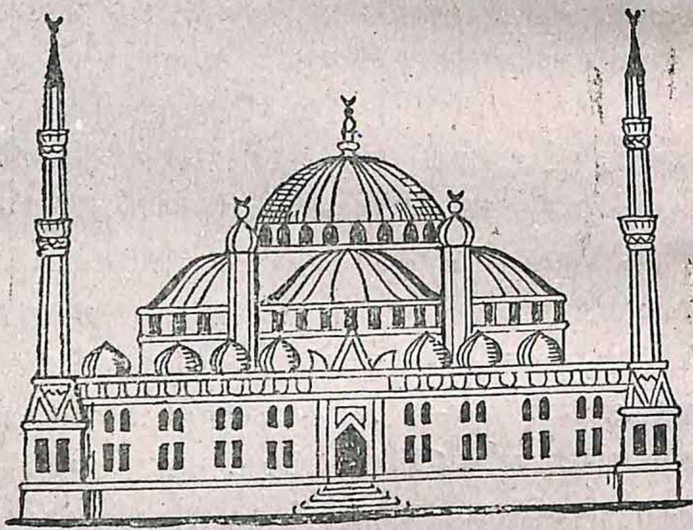
**গুরুত্ব**—জাস্টিনিয়নের সময়ে রোমান আইনসমূহকে সঙ্কলিত করা হয়েছিল বলেই রোমান আইন চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়নি। জাস্টিনিয়নের জন্যই পরবর্তী কালের মানুষ রোমান আইনের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। মধ্যযুগে তো বটেই আধুনিক যুগেও ইউরোপের অধিকাংশ দেশেরই আইন-ব্যবস্থার মূলে রয়েছে রোমান আইন। যদি সম্রাট জাস্টিনিয়ন আইন গ্রন্থ সঙ্কলনের মত দুরূহ কাজে উৎসাহী না হতেন তাহলে পরবর্তীকালের মানুষ এ সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারত না। রোমান সাম্রাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থার ক্রম-পরিবর্তন সম্পর্কেও এই আইন গ্রন্থ জানতে প্রচুর সাহায্য করে। জাস্টিনিয়নের আমলে রোমান আইনের ওপর ধর্মীয় প্রভাব কতখানি ছিল তাও জানা যেতে পারে জাস্টিনিয়ন বিধি থেকে।

**শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা**—শিল্পকলার পৃষ্ঠপেষোকরূপেও জাস্টিনিয়ন্ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। আগুন লেগে কনস্টান্টিনোপ্‌ল নগরীর একাংশ বিধ্বস্ত হয়। জাস্টিনিয়ন এই অংশকে সুশোভিত করার জন্য অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করেন। বহু সুরম্য সৌধ নির্মাণ করা হল। লক্ষণীয় যে এগুলির নির্মাণ-কৌশলে গ্রীক ও প্রাচ্য শিল্পরীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন শিল্পশৈলীর প্রবর্তন করা হ'ল—ইতিহাসে যার নাম 'বাইজেন্টাইন শিল্পকলা'। শুধুমাত্র রাজধানীতে নয়, জাস্টিনিয়নের উৎসাহে সাম্রাজ্যের সর্বত্রই অসংখ্য মঠ, দুর্গ, হাসপাতাল, স্তম্ভ, জলাধার নির্মিত হয়েছিল। এমন কি নতুন বিজিত রাভেনার অন্তর্গত স্যান ভাইটেলেও গির্জা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর আমলে নির্মিত গির্জাগুলি অতি মনোরম শিল্পশোভার নিদর্শন। সেন্ট-সোফিয়া ক্যাথিড্রালের হর্ম্য আজও শিল্প রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিক প্রোকোপিয়াস বলেছেন যে এটি গগনচুম্বী; এই অট্টালিকা থেকে সমগ্র কনস্টান্টিনোপ্‌ল নগরী দেখা যায়।

সেন্ট-সোফিয়া গির্জার উপরস্থ বিশাল গম্বুজ এই যুগের স্থাপত্য বিজ্ঞানের উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। গির্জার মধ্যস্থলে বর্গাকার ক্ষেত্রের চারিকোণে নির্মিত চারটি স্তম্ভের ওপরে একটি করে অর্ধগোলাকৃতি খিলান। এই খিলানগুলির উপরে বৃহৎ গম্বুজটি অত্যন্ত সুকৌশলে স্থাপন করা হয়েছে।

গির্জার কেন্দ্র-স্থলে স্থাপিত গম্বুজটির উচ্চতা মেঝে থেকে ১৭৯ ফুট। এর ব্যাস ১০৭ ফুট এবং গভীরতা ৪৬ ফুট। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন গম্বুজটি শূন্যে ঝুলছে।

এই অট্টালিকার স্তম্ভ ও মর্মর ফলকগুলি ছিল রঙ-বেরঙের; প্রোকোপিয়াস মন্তব্য করেছেন যে হঠাৎ এই প্রাসাদে এসে পৌঁছলে মনে হবে যেন নানা রঙ-বেরঙের ফুলের বাগানে আসা হয়েছে। প্রাচীর চিত্র অঙ্কনেও শিল্পীদের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আথোস পাহাড়ের মঠের দেওয়ালে এবং অন্যান্য মঠের দেওয়ালের গায়ে। এই



সেন্ট-সোফিয়া গির্জা

প্রাচীরচিত্র অঙ্কন-রীতি ইতালির শিল্পীদের অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। বাইজেন্টাইনের শিল্পীদের মোজেইকের কাজ ছিল খুব সুন্দর। শিল্পীর দল টুকরো টুকরো রঙীন কাচ ও পাথর দিয়ে মোজেইকের ওপর ছবি আঁকতেন। মোজেইকের ওপর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে সভাসদসহ জাস্টিনিয়ন এবং পরিচারিকাসহ রাণী থিওডোরার ছবি বিখ্যাত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বাইজেণ্টিয়াম্—বাইজেণ্টিয়াম্ সাম্রাজ্যের একদিকে কৃষ্ণসাগর ও এশিয়া-ইউরোপের মধ্যবর্তী মর্মর উপসাগর; অপর দিকে ভূমধ্যসাগর। এর ফলে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে সব

বাণিজ্য পথগুলি এসে বাইজেন্টিয়ামে মিশেছে। রাজধানী কনস্টান্টিনোপল সমুদ্রতীরে অবস্থিত। যোগাযোগের সুবিধা থাকায় বিশ্বের সব দেশেরই বাণিজ্যতরী এসে ভিড় করত। বিশ্বের বাজারে চাহিদা থাকায় সোনা, লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতি ধাতু থেকে শিল্পীদল সুন্দর সুন্দর নানান শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করত। বস্ত্র শিল্পেও বাইজেন্টিয়ামের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। জাস্টিনিয়নের সময়ে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন কারখানায় চিত্র-বিচিত্রিত রেশমী কাপড়ের উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল। এছাড়াও বাইজেন্টিয়ামে উৎপন্ন সূক্ষ্ম কাজ করা এনামেল, কাচ ও হাতির দাঁতের জিনিস ছিল অতি সুন্দর। এর জন্য রাজধানী কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ ও অন্যান্য নগরীগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে কনস্টান্টিনোপল্‌কে বলা হত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী নগরী।

**সংস্কৃতি সংরক্ষণের কেন্দ্র বাইজেন্টিয়াম**—জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র-রূপে কনস্টান্টিনোপল প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। নামে রোমান হলেও সংস্কৃতিতে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য ছিল গ্রীক। কনস্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রীক-সাহিত্য, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি পড়ান হ'ত। গ্রীক সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য কনস্টান্টিনোপলের মনীষীদের অবদান যথেষ্ট। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রীক সংস্কৃতির কোন চর্চা ছিল না। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা যখন কনস্টান্টিনোপ্‌ল দখল করে নিল গ্রীক পণ্ডিতেরা তখন তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে ইতালিতে চলে এলেন। তাদের কাছ থেকে ইউরোপীয়রা আবার গ্রীক দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করল। কন্‌স্টাণ্টাইন্‌ সেফালাস নামে একজন পণ্ডিত গ্রীক-সাহিত্যের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন। থিওফানেস এবং লিও লিখেছিলেন সমকালীন ইতিহাস। ঈজিনার পল মুসলিম ও গ্রীক চিকিৎসা বিদ্যা মিলিয়ে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। স্যালোনিকার লিও ছিলেন এই সময়ের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন—এমন কোন বিষয় নেই যার উপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেননি। কনস্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল সেল্লাস্‌

ছিলেন বাইজেণ্টাইনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনিও বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, সঙ্গীত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব ছাড়াও বহু প্রাচীন গ্রীক পুঁথিও নকল করা হয়। তাঁদের নকল করা পুঁথি পরবর্তী কালে ইতালিতে পৌঁছানোর ফলেই পশ্চিম ইউরোপ গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

(১) কনস্টানটাইন কেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? (২) জাষ্টিনিয়ন তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কী কী পন্থা গ্রহণ করেছিলেন? (৩) জাষ্টিনিয়নের রাজ্য বিজয় সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। (৪) 'জাষ্টিনিয়ন বিধি'র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কেন? (৫) জাষ্টিনিয়ন বিধি কাকে বলে? (৬) জাষ্টিনিয়ন বিধির গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। (৭) সেন্ট-সোফিয়া গির্জার স্থাপত্য কৌশল সম্পর্কে কি জান? (৮) বাইজেন্টিয়াম সাম্রাজ্যের বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে লেখ। (৯) বাইজেন্টিয়াম সংস্কৃতিতে বাইজেণ্টাইন পণ্ডিতগণের অবদান কি?

### সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

(১) রোমান সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিম অংশে যে দুজন সম্রাট নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন তাদের নাম কি? (২) বাইজেন্টিয়াম কোথায় অবস্থিত? (৩) কত খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপ্‌ল নগরীর পত্তন হয়? (৪) কোন্ কোন্ অঞ্চল বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল? (৫) কোন্ কোন্ অঞ্চল জাস্টিনিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল? কোন্ কোন্ বর্বর জাতি রোমান সাম্রাজ্যে ঢুকে উৎপাত করত? (৬) জাস্টিনিয়ন কেন উপজাতি সর্দারদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে আমন্ত্রণ জানাতেন? (৭) 'ইনস্টিটিউটস' কাকে বলা হয়? (৮) সেণ্ট-সোফিয়া গির্জা সম্পর্কে প্রোকোপিয়াস কি মন্তব্য করেছিলেন? (৯) বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যে জ্ঞান চর্চার ফলে পশ্চিম ইউরোপ কিভাবে উপকৃত হয়েছিল?

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

#### এক কথায় উত্তর দাও:

(১) কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান নাম কি? (২) প্যাট্রিয়ার্ক কাকে বলা হত? (৩) কত খ্রীষ্টাব্দে কনস্টানটাইন মেক্সেনটিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন? (৪) জাষ্টিনিয়ন কত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন? (৫) উত্তর আফ্রিকায় কোন্ বর্বর উপজাতি বাস করত? (৬) কত খ্রীষ্টাব্দে ইতালি জাষ্টিনিয়নের অধিকারভুক্ত হয়?

(৭) জাষ্টিনিয়ন সীমান্তে ক'টি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন? (৮) কত খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস বিধি রচনা করেছিলেন? (৯) ট্রিবোনিয়ান কে ছিলেন? (১০) জাষ্টিনিয়নের সময়ে সমগ্র বিধি ও বিধান সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম কি? (১১) 'নভেলস' কাকে বলে? (১২) গ্রীক ও প্রাচ্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণে যে শিল্পশৈলীর প্রবর্তন করা হল তার নাম কি? (১৩) কনস্টানটাইন সেফালাস কি লিখেছিলেন? (১৪) ঈজিনার পল কেন বিখ্যাত?

**শূন্যস্থান পূর্ণ কর:**

(১) — খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের আক্রমণে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। (২) বেলিসেরিয়াসের শৌর্যে ও চাতুর্যে — মধ্যে — অঞ্চল জাষ্টিনিয়নের অধিকার স্থাপিত হয়। (৩) রাজতন্ত্রের মহিমা বৃদ্ধি করতে জাষ্টিনিয়ন — উভয়ক্ষেত্রেই সর্বেসর্বা হয়েছিলেন। (৪) রোমান সম্রাট — কাল থেকে — পর্যন্ত রচিত বিধিগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ সরল ভাষায় — এক বছরের মধ্যে প্রকাশ করা হল। (৫) বাইজেণ্টাইন শিল্পশৈলীর প্রমাণ পাওয়া যায় — মঠের দেওয়ালে। (৬) রাজধানী — সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

**ভুল বাক্যকে ঠিক করে লেখ:**

(১) ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। (২) ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পো নদীর উত্তরস্থ সমগ্র অঞ্চল জাষ্টিনিয়নের অধিকারে আসে। (৩) জাষ্টিনিয়ন সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। (৪) জাষ্টিনিয়নের মত যাতে যাজক ও জনসাধারণ মেনে নেয় তার জন্য তিনি বলপ্রয়োগ করতেন না। (৫) ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাষ্টিনিয়ন বিধির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছিল। (৬) সেণ্ট-সোফিয়া গির্জার গম্বুজটি চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। (৭) থিওফানেস ও লিও গ্রীক সাহিত্য রচনা করেছিলেন। (৮) স্যালানিকার লিও ছিলেন একজন দার্শনিক।

**ডানদিকে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও:**

(১) কনস্টাণ্টাইন কনস্টাণ্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেন (৪১০ খ্রীষ্টাব্দে / ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে / ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে)।

(২) জাষ্টিনিয়নের আফ্রিকায় হস্তক্ষেপের কারণ (ভ্যাণ্ডালদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ / বেলিসেরিয়াসের উৎসাহ / পোপের নির্দেশ)।

(৩) জাষ্টিনিয়নের কাছে পরাজিত হন অষ্ট্রোগথদের শেষ রাজা (গোইসেরিক / এ্যালারিক / তোতিলা)।

(৪) অধিকৃত অঞ্চলে শান্তিরক্ষার জন্য জাষ্টিনিয়ন প্রয়োগ করেছিলেন (যুদ্ধনীতি / শত্রুতার নীতি / কূটনীতি)।

(৫) খ্রীস্টধর্মকে সর্বশক্তি দিয়েও উচ্ছেদ করতে পারেননি সম্রাট (কনস্টানটাইন / ডাইওক্লিটিয়ান / জাষ্টিনিয়ন)।

(৬) পরবর্তীকালের মানুষ রোমান আইনের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে (থিওডোসিয়াসের জন্য / হাড্রিয়ানের জন্য / জাষ্টিনিয়নের জন্য)।

(৭) প্রোকোপিয়াস ছিলেন একজন (শিল্পী / ঐতিহাসিক / সঙ্গীতজ্ঞ)।

(৮) সেণ্টসোফিয়া গির্জার স্তম্ভ ও মর্মর ফলকগুলি ছিল (রঙ বেরঙের / সাদা রঙের / লাল রঙের)।

(৯) জাষ্টিনিয়নের সময়ে মোজেইকের ওপর চিত্রিত একটি বিখ্যাত ছবি (সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট / যুদ্ধরত জাষ্টিনিয়ন / সভাসদ সহ জাষ্টিনিয়ন)।

(১০) মুসলিম ও গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যা মিলিয়ে বিশ্বকোষ রচনা করেন (মাইকেল সেল্লাস / কনস্টানটাইন সেফালাস / ঈজিনার পল)।

---

## পঞ্চম অধ্যায়

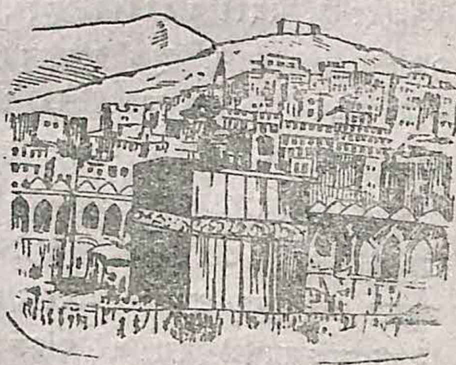
# ইসলাম ধর্ম ও তার অবদান

**পাঠ-সংকেত**—আরবদেশ ও সে দেশের অধিবাসী ● পয়গম্বর ও তাঁর ধর্মমত ● ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসারের কারণ ● খলিফা তন্ত্র ● আরব সাম্রাজ্য ● কর্ডোভা ● ইসলামের অগ্রসরে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া ● শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আরব মনীষীদের অবদান ● শিল্প।

**আরবদেশ ও সে দেশের অধিবাসী**—এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আরবদেশ অবস্থিত। এই দেশটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় উপদ্বীপ। এই দেশের উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। দেশের অধিকাংশই মরুভূমি অঞ্চল এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। মরুভূমির মাঝে মাঝে মরূদ্যান। কয়েকটি ছোট ছোট নদী এই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। তার কোনোটিই নৌ-চলাচলের উপযোগী নয়। নদী-তীরস্থ অঞ্চল ছাড়া দেশের আর কোথাও ফসলও ফলে না।

আরবের মরু অঞ্চলে কোন স্থায়ী কৃষিজীবী সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই যাযাবর। তাদের বলা হ'ত বেদুইন। তবে সমুদ্র উপকূলে পূর্বে ও পশ্চিমে অবশ্য গড়ে উঠেছে অনেক নগরী। এই নগরী-

গুলিতে চলত ব্যবসা-বাণিজ্য। মক্কা ও মদিনা ছিল আরবের দুইটি প্রধান শহর। এই দুইটি শহরই লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে গড়ে উঠেছিল। বেদুইনদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন। গাছের খেজুর, পশু মাংস ও দুধ ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। আবার যাযাবররা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াবার ফলে তাদের কোন সংগঠিত রাষ্ট্র ছিল না। গোষ্ঠীর প্রতি তাদের সীমাহীন আনুগত্য ছিল। কোন দল অথবা গোষ্ঠীর কোন সদস্য দলের লোকেরা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ত না। আরবেরা অত্যন্ত নির্ভীক প্রকৃতির লোক এবং স্বাধীনতা-প্রিয়। কোন-না-কোন বিষয় নিয়ে আরব-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। আরবদের আলাদা ব্যক্তিগত কোন পরিচয় ছিল না। গোষ্ঠীর নামেই তাদের পরিচয়, আর নগরের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে পরিবারের নামই পরিচয়ের প্রধান চিহ্ন ছিল। আরবদের দেবদেবীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশত। তারা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করত। মক্কা ছিল তাদের পবিত্র তীর্থস্থান। মক্কায় কাবা মসজিদে হজরে আসওয়াদ্ (কালোপাথর) নামে কালো রঙের একটি পাথর আছে। তাদের কাছে মন্দিরটি খুবই পবিত্র।


পুণ্যতীর্থ কাবা মসজিদ

**পয়গম্বর ও তাঁর ধর্মমত**—আনুমানিক ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হজরৎ মহম্মদ মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লা ও মাতার নাম আমিনা। 'মহম্মদ' শব্দটির অর্থ 'বহু প্রশংসিত'। তিনি ছিলেন কুরেইসি গোষ্ঠীর লোক। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খাদিজা নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। মহম্মদ ছিলেন খুবই চিন্তাশীল ব্যক্তি। আরবদের বহু দেবতায় বিশ্বাস, মূর্তি পূজা, পরস্পর হানাহানি তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল। আরবদের মধ্যে বিভেদ দূর করে তাদের নৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য।

চল্লিশ বছর বয়সে মহম্মদ গভীরভাবে ধর্ম-চিন্তায় মগ্ন হন। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে হীরা পাহাড়ের একটি গুহায় বহুদিন উপবাসে, প্রার্থনায় ও ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন। কিম্বদন্তী আছে যে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে একাকী যখন তিনি গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেই সময়ে স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল তাঁকে দেখা দিয়ে আল্লার বাণী তাঁর কাছে প্রকাশ করলেন। মহম্মদ বুঝতে পারলেন যে জিব্রাইল মারফং তাঁকে আল্লা তাঁর বাণী প্রচারের নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপর তিনি ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করলেন।

মহম্মদ নতুন ধর্মমত প্রচার করেননি। ইসলাম ধর্ম প্রথম প্রতিভাত হয় আব্রাহাম এবং তাঁর পরিজনদের কাছে। আব্রাহামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলের বংশধর আরবগণ। কুরআনে বলা হয়েছে যে মহম্মদের পূর্বে ২৫ জন পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। এদের মধ্যে মুসা ও যীশুখ্রীষ্টের নাম আছে। তবে মহম্মদই শেষ পয়গম্বর। তিনি পুরানো ধর্মমতের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে তা প্রচার করেন।

হজরৎ মহম্মদের কাছে এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন প্রথমে তাঁর স্ত্রী খাদিজা, আত্মীয় আলি, ভৃত্য জৈদ এবং জ্ঞাতি আবুবক্র। হজরৎ মহম্মদ এই নতুন প্রচারিত ধর্মের নাম দিলেন 'ইসলাম' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের নিকট আত্ম-সমর্পণ' এবং এই ধর্মমত যাঁরা অনুসরণ করলেন তাঁদের বলা হ'ল 'মুসলমান' অর্থাৎ 'যারা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।' হজরৎ মহম্মদ প্রচার করলেন আল্লা ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর প্রেরিত পুরুষ। আল্লা সর্বশক্তিমান। তিনি মূর্তি-পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর কুরআন সংকলিত হয়। এটি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কুরআন মোট ১১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। কুরআনে মুসলমানদের কতকগুলি নীতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেগুলি হ'ল—দান, বিনয়, সহিষ্ণুতা, শত্রুকে ক্ষমা করা, লোভহীনতা, বিদ্বেষভাব পোষণ না করা, সুদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, সুরাপান না করা ইত্যাদি। মহম্মদ মুসলমানদের প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ পড়ার এবং রমজান মাসে উপবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে একমাত্র কুরআনের নির্দেশই মুসলমানদের কাছে চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য।

মহম্মদ কাবার মসজিদের মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলতে বলেছিলেন। কুরেশি সম্প্রদায় ছিল গোঁড়া পৌত্তলিক। তারা মহম্মদের এই নতুন ধর্মকে মোটেই সুনজরে দেখল না। মহম্মদের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করল। প্রাণ বিপন্ন দেখে মহম্মদ সশিষ্য ৬২২ খ্রীঃ মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেলেন। মক্কা থেকে মহম্মদের মদিনা যাত্রা ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় রাখবার জন্য ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুসলমানগণ হিজরী অব্দ গণনা করেন।

হজরৎ মহম্মদের মদিনায় থাকাকালীন মক্কা ও মদিনার সঙ্গে শত্রুতা ও সংঘর্ষ চলতে লাগল। ইতিমধ্যেই তিনি মদিনার শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কা আক্রমণ করলেন এবং বিনা বাধায় হজরৎ মহম্মদ মক্কা দখল করলেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের প্রতি প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি সদয় ব্যবহার করলেন। ফলে মক্কার অধিবাসীরাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসারের কারণ—হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর এক'শ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঐতিহাসিকগণ এত দ্রুত ধর্ম প্রসারের পিছনে বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করেন।

প্রথমতঃ, হজরৎ মহম্মদ প্রচার করেছিলেন যে ইসলাম ধর্মের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গের দুয়ার খোলা থাকবে। সুতরাং ধর্মের প্রলোভনে দুর্ধর্ষ আরবগণ প্রতিবেশী দেশগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং একের পর এক দেশ জয় করে নিল। তারপর বিজিত দেশের অধিবাসীদের জোর করে ধর্মান্তরিত করল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই মত গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁরা বলেন যে মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলে খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং জুডা ধর্মাবলম্বীগণ যে পাশাপাশি সুখে-শান্তিতে বাস করত তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং জোর করে সবাইকে ধর্মান্তরিত করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, আরবদেশ মোটেই সমৃদ্ধশালী ছিল না। সেই তুলনায় সিরিয়া, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশগুলি ছিল ধনী। ইসলাম্ ধর্ম প্রবর্তনের আগে আরবদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। তাই তারা প্রতিবেশী দেশ আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু ইসলাম ধর্ম তাদের ঐক্যবদ্ধ

শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিল। তাই নতুন দেশ জয় করতে তাদের কোন অসুবিধে রইল না।

তৃতীয়তঃ, দুর্দান্ত যুদ্ধপ্রিয় আরব বেদুইনদের বশে রাখতে হলে তাদের যুদ্ধ-পিপাসা মেটানো প্রয়োজন। সেজন্য খলিফারা তাদের পাশাপাশি দেশ আক্রমণ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তারপরে বিজিত দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ, খ্রীষ্টান ধর্ম বা জুডা ধর্মের মধ্যে অনেক গলদ ঢুকেছিল। ধর্মীয় ব্যবস্থাও হয়ে পড়েছিল ক্রমশঃ জটিল। সাধারণ মানুষ এই জটিলতার হাত থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় আরবদের জয়লাভের ফলে পারস্য, আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণের ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচয় হ'ল এবং এই ধর্ম তাদের আকৃষ্ট করল।

পঞ্চমতঃ, ইসলাম ধর্ম সহজ ও সরল, রাজা-উজীর থেকে দীন-দরিদ্র মানুষ সকলেরই ইসলাম ধর্মে সমান স্থান। কেউ বড় নয় বা কেউ ছোট নয় —ইসলাম ধর্মমতের এই সাম্যবাদ সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে এবং এই ধর্মমতের দ্রুত প্রসার ঘটায়।

খলিফাতন্ত্র—খলিফা শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি। মহম্মদের মৃত্যুর পরে যাঁরা সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁদের বলা হয় খলিফা। শুধু শাসক নয়, তাঁরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের ধর্মগুরু। খলিফাদের ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে।

প্রথম পর্যায়ে, যারা ধর্মগুরু মহম্মদের সাক্ষাৎ শিষ্য ও অনুচর তাদের মধ্য থেকেই খলিফাদের একের পর এক নির্বাচিত করা হ'ল। মহম্মদের একান্ত অনুগত শিষ্য ও শ্বশুর আবুবক্রকে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সকলে মিলে প্রথমে খলিফার পদে বসিয়েছিল। আবুবক্রের পরে ওমর, ওসমান ও আলি পরপর খলিফা হয়েছিলেন। এই সময়ে রাজধানী ছিল মদিনা। ৬৩২ খ্রীঃ থেকে ৬৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত চলল প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থায়িত্ব কাল ৬৬১ খ্রীঃ থেকে ৭৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত। ওম্মিয়াদ বংশীয় খলিফাগণ এই সময়ে রাজত্ব করেন। আলির মৃত্যুর পর খলিফা পদ নিয়ে বিবাদ ও হানাহানি শুরু হয়। সিরিয়ার শাসনকর্তা

মুয়াউইয়া আলির দুই পুত্র হাসান ও হোসেনকে বঞ্চিত করে খলিফা হয়ে বসলেন। আরম্ভ হল ওম্মিয়াদ বংশের শাসন। মুয়াউইয়ার পরে খলিফা হন তার পুত্র এজিদ। এজিদের ষড়যন্ত্রে হাসান নিহত হয়েছিলেন। এজিদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে হোসেন সপরিবারে মদিনা ছেড়ে কুফা নগরীর দিকে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু পথ ভুলে তারা কারবালা মরুভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। সুযোগ বুঝে এজিদের সৈন্যরা হোসেনের শিবিরে জল আসার পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে হোসেন ও তার পরিবারের সকলে প্রচণ্ড পিপাশায় ও শত্রুদের আক্রমণে প্রাণ হারান। আজও মুসলমানরা হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মহরমের দিন শোক পালন করে থাকে। এর পর থেকেই মুসলমানগণ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হাসান-হোসেনকে যারা মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে মনে করে তাদের বলা হয় শিয়া, আর যারা এ মত মানেন না তারা সুন্নী নামে পরিচিত। এই সময়ে মদিনা থেকে দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। ওম্মিয়াদ বংশীয় খলিফাগণের আমলে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে মুসলমান শাসন প্রসারিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে ( ৭৫০ খ্রীঃ—১২৫৮ খ্রীঃ ) আব্বাসিদ বংশীয় খলিফাগণ রাজত্ব করেন। ওম্মিয়াদ বংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে এই বংশ স্থাপন করেন মহম্মদের এক জ্ঞাতির বংশধর আব্-উল-আব্বাস। খলিফাগণের আমলে রাজধানী পুনরায় দামাস্কাস থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। এতদিন ইসলাম ধর্ম বলতে আরববাসীদের ধর্ম বুঝাত। কিন্তু বাগদাদে রাজধানী চলে যাওয়ায় ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর পারস্যের প্রভাব এবার প্রবল হ'ল। আব্বাসিদ বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুণ-অল্-রসিদ ( ৭৮৬ খ্রীঃ —৮০৯ খ্রীঃ )।

আরব সাম্রাজ্য—হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুকালে আরব সাম্রাজ্য শুধুমাত্র আরব দেশের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একশত বছরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য বিশাল বিস্তৃতি লাভ করে। পারস্য, আফগানিস্থান, ইরাক, তুর্কীস্তান, মিশর, উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভাগ, স্পেন সব অঞ্চলই ক্রমশঃ আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

**কর্ডোভা**—স্পেনেও ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হয়। এই কৃতিত্ব ওম্মিয়াদ ৰংশের খলিফা হাসিমের পৌত্র আবদ্-আর-রহমানের প্রাপ্য। তিনি স্পেনে ৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভায়। জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্যে এই শহর ছিল অতুলনীয়। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ছাত্রের দল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত। জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় এখানে পড়ান হত। স্পেনে মুসলমান শাসকদের আমলে শিল্পকলায়ও




ইসলাম ধর্মের বিস্তার
৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ

অভাবনীয় উন্নতি হয়। গ্রানাডা শহরে অবস্থিত আলহামরা মসজিদটি এ আমলের স্থাপত্য-শিল্পে দক্ষতার একটি অপূর্ব নিদর্শন।

**ইসলামের অগ্রসরে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া**—মুসলমানগণ স্পেন থেকে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের শাসক আব্‌দ-আর-রহমান সৈন্যবাহিনী নিয়ে পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে গলদেশ আক্রমণ করেন; কিন্তু পঁইতিয়ার্সের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যরা অস্ট্রেশিয়ার ডিউক চার্লসের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন। এই যুদ্ধের ফলেই ইসলাম ধর্ম পিরেনিজ পর্বতমালা পার হয়ে ইউরোপে আর প্রসারিত হতে পারল না। এই যুদ্ধের গুরুত্বের জন্যই বিজয়ী বীর চার্লসকে, চার্লস মার্তেল নামে অভিহিত করা হল। মার্তেল কথার অর্থ 'হাতুড়ি'।

পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করতে না পারলেও ইউরোপীয় ও আরবগণ পাশাপাশি বসবাসের ফলে মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতার উপর মুসলিম সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আরব মনীষীদের অবদান—শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খলিফাদের আমল বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই যুগে সংস্কৃতির যে সুন্দর রূপটি ফুটে উঠেছে তার পিছনে শুধু আরব নয় অন্যান্য দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরও অবদান রয়েছে। সেইজন্য এই সংস্কৃতিকে 'মুসলিম সংস্কৃতি' রূপে অভিহিত করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা মুসলমানদের সৃজনশীল প্রতিভার সংস্পর্শে এসে সজীব হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য—সাহিত্য, বিশেষতঃ লিরিক কবিতা, রূপকথা ও উপকথা রচনায় মুসলমান সাহিত্যিক আশ্চর্য কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার হওয়ার আগে আরবি ভাষার ছিল একান্ত আদিম অবস্থা। সেই অবস্থা থেকে দ্রুতগতিতে যেভাবে আরবি এক অপূর্ব সুমধুর লালিত্য-পূর্ণ ভাষায় রূপান্তরিত হল তা সত্যই বিস্ময়কর। সমকালীন ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় আরবি ভাষা ছিল বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রোভেঁস ও ইতালির প্রথম যুগের বেশ কিছু রচনায় আরবি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বর্তমানকালেও আরব্যোপন্যাস ও ওমর খৈয়মের অসাধারণ জনপ্রীতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিজ্ঞান—বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও আরব মনীষার অবদান যথেষ্ট। আরব পণ্ডিতগণ যেখানে যা পেয়েছেন তাই দিয়ে তাঁদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে ভারতবর্ষ থেকে সংস্কৃতে লেখা পুঁথি সংগ্রহ করে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এমনিভাবে গ্রীস থেকে তাঁরা শিখেছেন ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা। খলিফা আলমামুন্ বাগদাদে অনুবাদ করার একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক পুঁথির সন্ধানে সুদূর ভারতে ও কনস্টান্টিনোপলে দূত পাঠিয়েছিলেন। বাগদাদে এই সময়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন হুনায়িন্-ইব্‌ন-ইসাক্। তিনি ধর্মে খ্রীষ্টান। তিনি, তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র

—এই তিনজনে মিলে বহু গ্রন্থ গ্রীক থেকে সিরীয় ও আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক গালেন ও হিপ্‌পোক্রেটিস-এর গ্রন্থও অনূদিত হয়। এইভাবে হুনায়িনের চেষ্টায় গ্রীক চিকিৎসকদের জ্ঞান-ভাণ্ডার আরবগণের নিকট উন্মুক্ত হয়। ঐস্লামিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন আল্‌রাজি। তিনি দুইশতেরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে কুড়ি খণ্ডে তাঁর লেখা 'চিকিৎসা শাস্ত্র' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ। কিন্তু আরবি চিকিৎসকদের মধ্যে আভিচেন্নার মত আর কেউ ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁর রচিত প্রায় সব গ্রন্থই লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ইবন-খালদুন ছিলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ভৌগোলিক পরিবেশ কীভাবে ইতিহাসকে প্রভাবিত করে তিনি এ সম্পর্কে প্রথম লেখেন। পদার্থবিদ্যাতে আল্‌-কিন্দি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। বিজ্ঞানের জোয়ার-ভাঁটা, আলোর প্রতিফলন, সঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি ২৬৫টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমির রচনা, ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস্ অফ জিওমেট্রি' আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ভারত ও গ্রীসের অঙ্কশাস্ত্রকে ভিত্তি করে মুসলমান বিজ্ঞানীগণ বীজগণিতে প্রভূত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আলু-খাওয়ারিজমি ও কবি ওমর খৈয়ম ছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট বীজগণিতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 'এ্যাল্‌জেবরা' শব্দটি আরবদের অবদান।

রসায়ন বিদ্যা—রসায়ন শাস্ত্রেও আরবের পণ্ডিতদের অবদান রয়েছে। 'এ্যালকেমি' সম্পর্কে দশম শতকের পণ্ডিত জাবিরের গবেষণা বিশেষ মূল্যবান।

দর্শন—দর্শন শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও আরব পণ্ডিতগণের চিন্তাধারায় গ্রীক প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোতল ও প্লেটোর প্রায় সব গ্রন্থই আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তুরস্কের দার্শনিক আল্ ফারাবি এ্যারিস্টোতলের দর্শনের টীকাভাষ্য রচনা করেছিলেন। দর্শনের যুক্তিবাদ ও ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস—এই দুই আপাত বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে মুসলমান দার্শনিকগণ সমতা আনার চেষ্টা করেছেন।

বাগদাদ, নিসারপুর, দামাস্কাস, জেরুজালেম, মিশর, আলেকজান্দ্রিয়া

ও কর্ডোভা খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়ে উঠেছিল জ্ঞানচর্চার বিশিষ্ট পীঠস্থান। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ। তাঁদের চিন্তাধারা ও রচনা পরবর্তীকালের ইউরোপকে প্রভাবিত করেছে।

শিল্প—শিল্পকলার ক্ষেত্রেও আরব শিল্পীগণ পিছিয়ে ছিলেন না। বাগ্‌দাদ, দামাস্কাস, সামারা, কায়রো, কার্ডোভা প্রভৃতি স্থানের মস্‌জিদ স্থাপত্যের পরিকল্পনা মুসলমান শিল্পীদের শিল্পকুশলতার পরিচয় প্রদান করে। ইউরোপের গথিক রীতি আরব শিল্পীদের স্থাপত্য কলার নিকট প্রচুর ঋণী। মধ্যযুগীয় ইউরোপে জমিদারদের যেসব প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল তাদের উপরেও মধ্যপ্রাচ্যের দুর্গ-নির্মাণশৈলীর ছাপ পড়েছে।

এইভাবে গ্রীস ও ভারত থেকে প্রতিটি বিষয়ে আরবের পণ্ডিতগণ জ্ঞান আহরণ করেছেন। আরবদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপ আবার এই বিচিত্র জ্ঞান ভাণ্ডারের স্বাদ গ্রহণ করেছে।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

(১) আরবদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লেখ। (২) 'বেদুইন' কাদের বলা হয়? তাদের জীবন-যাত্রা বর্ণনা কর। (৩) প্রাচীন আরবদের ধর্ম সম্পর্কে যা জান লেখ। (৪) 'কুরআন' সম্পর্কে যাহা জান লেখ। (৫) হজরৎ মহম্মদের জীবনী বিবৃত কর। (৬) ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসারের কারণগুলি নির্ণয় কর। (৭) খলিফাতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস সম্পর্কে লেখ। (৮) মহরমের দিন মুসলমানরা কেন শোক পালন করে? (৯) কর্ডোভা সম্পর্কে যা জান লেখ। (১০) সমগ্র ইউরোপে মুসলমান সাম্রাজ্য কেন প্রসারিত হল না? মুসলমান আক্রমন ইউরোপে কিভাবে প্রতিহত করা হয়েছিল? (১১) গণিতশাস্ত্রে আরবীয়গণের কৃতিত্বের কথা সংক্ষেপে লেখ। (১২) চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরবীয় মনীষীগণের অবদান কি? (১৩) আরবী সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে লেখ। (১৪) মুসলমান দার্শনিকদের কৃতিত্বের বিবরণ দাও।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ** (১) গোষ্ঠীর সঙ্গে আরব যাযাবরদের সম্পর্ক কিরূপ ছিল? (২) হজরৎ মহম্মদ কখন আল্লার প্রত্যাদেশ পান? (৩) হজরৎ মহম্মদ কি প্রচার করেছিলেন? (৪) হজরৎ মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসার

কারণ কি? (৫) আরবরা বিজিত দেশের অধিবাসীদের জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল—এই মত কতদূর গ্রহণযোগ্য? (৬) ওম্মিয়াদ বংশীয় খলিফাতন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। (৭) হুমায়িন-ইবন্-ইসাকের নাম কেন বিখ্যাত? (৮) কোন্ কোন্ স্থানের মসজিদ-স্থাপত্য মুসলমান শিল্পীদের শিল্পকুশলতার পরিচয় দেয়?

**বিষয়মুখী প্রশ্ন**

**এককথায় উত্তর দাও ঃ** (১) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপদ্বীপের নাম কি? (২) আরবের দুটি প্রধান শহরের নাম লেখ। (৩) বেদুইনদের প্রধান জীবিকা কি? (৪) হজরৎ মহম্মদের পিতা ও মাতার নাম কি? (৫) কত বছর বয়সে মহম্মদ গভীরভাবে ধর্মচিন্তায় মগ্ন হন? (৬) 'হিজরী অব্দ' কবে থেকে গণনা করা হয়? (৭) মহম্মদ কোন্ গোষ্ঠীর লোক ছিলেন? মহম্মদের আগে কতজন পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন? (৮) মহম্মদের কাছে কে কে প্রথম ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন? (৯) প্রথম খলিফা কে হয়েছিলেন? (১০) আলির দুই পুত্রের নাম কি? (১১) মুসলমানদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ কর। (১২) কোন্ স্থানে হোসেন প্রাণত্যাগ করেন? (১৩) আব্বাসিদ বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফার নাম কি? (১৪) কোন্ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আরবরা পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি? (১৫) আব্দ-আর রহমান কে? (১৬) কর্ডোভা কার রাজধানী? (১৭) একজন আরব ঐতিহাসিকের নাম লেখ। (১৮) আরবি সাহিত্যের প্রভাব ইউরোপের কোন্ কোন্ অঞ্চলের সাহিত্যের উপর লক্ষ্য করা যায়? (১৯) খলিফাদের আমলে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে যে সব স্থান বিখ্যাত হয়েছিল তার মধ্যে দুটি স্থানের নাম লেখ। (২০) ইউরোপীয় স্থাপত্যকলার কোন্ রীতির উপরে আরবি স্থাপত্যরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়?

**ডানদিকে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও ঃ**

(১) আরব দেশ অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের (উত্তর-পূর্ব অংশে / দক্ষিণ-পূর্ব অংশে / দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে)।

(২) প্রাচীন আরবদের দেবদেবীর সংখ্যা ছিল প্রায় (পাঁচশত/চারশত/তিনশত)।

(৩) মক্কার মসজিদটির নাম (আলহামরা মসজিদ / কাবা মসজিদ / জামা মসজিদ)।

(৪) হজরৎ মহম্মদ মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন (৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে / ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে / ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে)।

(৫) মহম্মদ শব্দটির অর্থ (বহুজন পূজ্য / বহু প্রশংশিত / বিরাট ধনী)।

(৬) মহম্মদ প্রায়ই ধ্যানমগ্ন থাকতেন ( হিমালয়ের গুহায় / হীরা পাহাড়ের গুহায় / মদিনার কাছে একটি গুহায় ) ॥

(৭) ইসলাম শব্দের অর্থ ( ধর্মের জয় / ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ / ঈশ্বরে বিশ্বাস )।

(৮) 'মুসলমান' শব্দের অর্থ ( যারা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে / যারা প্রচুর বিত্তবান / যারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন )।

(৯) মহম্মদ মক্কা আক্রমণ করলেন ( ৬২৪ খ্রীঃ / ৬৩০ খ্রীঃ / ৬৩২ খ্রীঃ )।

(১০) মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান ( কাবা মসজিদ / মদিনার মসজিদ / কর্ডোভার মসজিদ )।

(১১) কুরআনে আছে মোট ( ১২০টি অধ্যায় / ১১৪টি অধ্যায় / ২৪৪টি অধ্যায় )।

(১২) খলিফা শব্দের অর্থ ( রাজা / বিদ্বান / প্রতিনিধি )।

(১৩) হাসান নিহত হয়েছিলেন ( এজিদের ষড়যন্ত্রে / মুয়াউইয়ার ষড়যন্ত্রে / আবুবকরের ষড়যন্ত্রে )।

(১৪) হোসেন মদিনা ছেড়ে রওয়ানা দিয়েছিলেন ( কুফা নগরীর দিকে / কারবালার দিকে / বাগদাদের দিকে )।

(১৫) আব্বাসিদ বংশ স্থাপন করেন ( হারুণ-অল্-রসিদ / আবদ্-আর-রহমান / আব-উল-আব্বাস )।

(১৬) মার্ত্তেল উপাধি পেয়েছিলেন ( এজিদ / চার্লস / শার্লেমান )।

(১৭) এ্যালজেবরা শব্দটি ( আরবদের অবদান / গ্রীকদের অবদান / ভারতীয়দের অবদান )।

(১৮) আরবি চিকিৎসকদের মধ্যে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন ( আলরাজি / হুনায়িন-ইবন-ইসাক / আভিচেন্না )।

(১৯) গ্রানাডা শহরে অবস্থিত মসজিদটির নাম ( আল হামরা / নাখোদা / হজরতবাল )।

(২০) তুরস্কের দার্শনিক আল ফারাবি রচনা করেছিলেন ( প্লেটোর দর্শনের টীকা-ভাষ্য / এ্যারিস্তোত্‌লের দর্শনের টীকাভাষ্য / ভারতীয় দর্শনের টীকাভাষ্য )।

**ভুল বাক্যকে ঠিক করে লেখ :** (১) আরব দেশের দক্ষিণে লোহিত সাগর। (২) আরব দেশের অধিকাংশই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। (৩) হজরৎ মহম্মদ পৌত্তলিকতার সমর্থক ছিলেন। (৪) হজরৎ মহম্মদ মদিনায় চলে গেলে মক্কা ও মদিনার সঙ্গে মিত্রতা চলতে লাগল। (৬) ৬৩৫ খ্রীঃ হজরৎ মহম্মদের মহাপ্রয়াণ ঘটে। (৭) ইংলণ্ডের প্রথম যুগের বেশ কিছু রচনায় আরবি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর : (১) বেদুইনদের প্রধান জীবিকা ছিল—। (২) মহম্মদ—জন্মগ্রহণ করেন। (৩) মহম্মদ—নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। (৪) —মহম্মদের কাছে আল্লার বাণী প্রকাশ করলেন। (৫) —মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। (৬) মহম্মদের মৃত্যুর পরে প্রথম খলিফা হন —। (৭) — আলির দুই পুত্র হাসান ও হোসেনকে বঞ্চিত করে খলিফা হয়ে বসলেন। (৮) আব্বাসিদ খলিফাগণের আমলে রাজধানী দামাস্কাস থেকে — স্থানান্তরিত হয়। (৯) — বাগদাদে অনুবাদ করার একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (আনুমানিক ৮০০—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

**পাঠ-সংকেত**—শার্লেমান ● পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ● শার্লেমানের অভিষেকের গুরুত্ব ● রাষ্ট্র ওচার্চের পারস্পরিক সম্পর্ক ● চার্লসের রাজসভা ও শিল্প-সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা ● সাধু ও সন্ন্যাসীদের মঠ ● সেন্ট বেনেডিক্টের নির্দেশ ও মঠের জীবন ● শিক্ষার ক্ষেত্রে মঠের অবদান ● ক্লুনি মঠ ● ইনভেষ্টিচার প্রসঙ্গে দ্বন্দ্ব ● একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বিদ্যাচর্চ্চা ● বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলনী।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘ কয়েক শতক আর সেখানে কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি। জার্মান উপজাতিরা বিভিন্ন অঞ্চলে এই সময়ে বহু নতুন রাজ্য গড়ে তোলে। এইসব উপজাতিদের মধ্যে ফ্রাংকরাই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। বর্তমানের ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছু অংশ নিয়ে তাদের রাজ্য গঠিত ছিল।

**শার্লেমান**—আরবদের যুদ্ধে হারিয়ে ক্যারোলিঞ্জিয়ান বংশের চার্লস মার্ত্তেল কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর পুত্র পেপিন ফ্রাঙ্কদের রাজা হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে পেপিন তাঁর রাজ্য দুই পুত্র চার্লস ও কার্লোমানকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করেন। কয়েক বছরের মধ্যে কার্লোমানের মৃত্যু হওয়ায় তিনি

সম্পূর্ণ পিতৃরাজ্যের অধীশ্বর হন। চার্লসকে শার্লেমান বা মহান[১] চার্লস বলা হয়।

**পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা (৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)**—চার্লস ছিলেন একজন অসাধারণ বীর। সারাজীবন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ হেড্রিয়ানের আমন্ত্রণে তিনি লম্বার্ডি আক্রমণ করেন এবং সেখানকার রাজা ডেসিডেরিয়াসকে হারিয়ে দিয়ে নিজেকে লম্বার্ডির রাজা রূপে ঘোষণা করেন। স্যাক্সন জাতিকে পরাজিত করা চার্লসের রাজত্বের অন্যতম ঘটনা। এই জাতিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে চার্লসকে মোট আঠারো বার অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছিল।


শার্লেমান

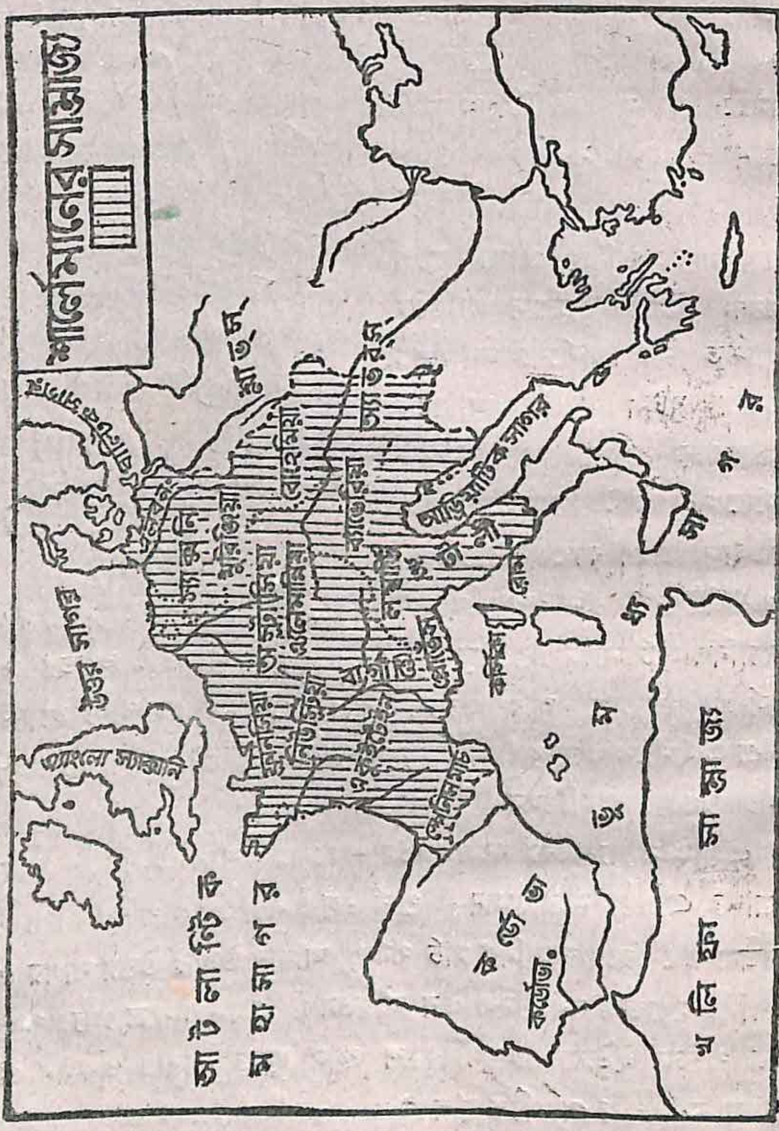
৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্পেন আক্রমণ করে পিরেনিজ পর্বতমালার দক্ষিণে 'স্প্যানিশ মার্চ' নামে একটি ভূখণ্ড লাভ করেন। হাঙ্গেরীর আভর জাতি চার্লসকে তাদের অধিপতিরূপে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সমগ্র জার্মানীকে তাঁর অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাভেরিয়া, ডাচি অধিকার করেছিলেন।

এইসব রাজ্য জয়ের ফলে অষ্টম শতকের শেষে চার্লস এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্বে এল্‌ব নদী থেকে পশ্চিমে পিরেনিজ পর্বতমালা পেরিয়ে স্প্যানিশ মার্চ পর্যন্ত, আবার উত্তরে উত্তর সাগর থেকে ইতালির মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল এর আয়তন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আবার একজন খ্রীষ্টান নৃপতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

---

১. Charle=Charles (চার্লস) আর magne=the great (মহান)।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে খ্রীষ্টের জন্মদিনে চার্লস রোমে সেন্টপিটার গির্জায় পবিত্র বেদীর সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। এমন সময় পোপ তৃতীয় লিও হঠাৎ এসে তাঁর মাথায় রাজকীয় মুকুট স্থাপন করলেন।




উপস্থিত সমবেত জনতা সহর্ষে চার্লসকে 'রোমান সম্রাট' রূপে অভিবাদন জানালো। তারা মনে করেছিল যে বুঝি পুরানো রোমান সাম্রাজ্যের

পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটল। পশ্চিম ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত এই নতুন সাম্রাজ্যকে ইতিহাসে "পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য" আখ্যা দেওয়া হয়।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের বৈসাদৃশ্য ছিল প্রচুর। প্রথমতঃ, শার্লেমান জাতিতে জার্মান। দ্বিতীয়তঃ, রোমান সাম্রাজ্যের তুলনায় নতুন প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্য আয়তনে অনেক ছোট। তৃতীয়তঃ, রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট স্থানে শার্লেমানের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল না। চতুর্থতঃ, উভয় সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও এই বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এইসব কারণে বর্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে শার্লেমান প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয়।



পোপ লিও শার্লেমানকে রাজকীয় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন

শার্লেমানের অভিষেকের গুরুত্ব—'পবিত্র রোমান সম্রাট' রূপে শার্লেমানের অভিষেকের ঘটনাটি মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে চলছিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। কিন্তু শার্লেমানের অভিষেকের পর থেকে ইউরোপে ধীরে ধীরে আবার শৃঙ্খলা ফিরে আসে। জাতিতে শার্লেমান ছিলেন জার্মান। সুতরাং তাঁর সিংহাসন লাভে জার্মান জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হল রোম। তাই শার্লেমানের পর যাঁরা 'পবিত্র রোমান সম্রাট' পদে অভিষিক্ত হতেন তাঁরা প্রত্যেকে রোম শহর দখল করা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। এর ফলে মধ্যযুগে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল।

শার্লেমান নিজে ছিলেন ধর্মে খ্রীষ্টান। তাই তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র খ্রীষ্টধর্ম প্রসারিত হয়েছিল।

এছাড়াও শার্লেমানের অভিষেকের ফলে জার্মান ও রোমান সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তার ফলে ইউরোপে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি জন্মলাভ করে।*

ধর্মীয় ব্যাপারে পোপের সঙ্গে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিশপ এমন কি রোমান সম্রাটের সঙ্গেও বিরোধ দেখা দিয়েছিল। রোমের জনসাধারণও পূর্ব রোমান সম্রাটের প্রতি মোটেই অনুরক্ত ছিল না, কারণ বিপদের দিনে সম্রাট তাদের রক্ষা করতে পারেননি। এখন শার্লেমানের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি-রূপে অভিষেক গ্রহণের ফলে বাইজেণ্টাইন সম্রাটের সঙ্গে রোমান জনগণের ও পোপের কোন সম্পর্কই আর রইল না। রাজনৈতিক দিক থেকে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল।

রাষ্ট্র ও চার্চের পারস্পরিক সম্পর্ক—চার্লসের মাথায় মুকুট পরাবার কোন আইনানুগ অধিকার পোপের ছিল না। রোমান জনতা কর্তৃক এর আগে কাউকে সম্রাট পদে বরণ করে নেওয়ারও কোন নজীর নেই।

সেইজন্য চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠান পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্ক নিরূপণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। পোপ এবং পবিত্র রোমান সম্রাট—এই দুই-এর মধ্যে কার মর্যাদা বেশী—এই প্রশ্ন ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পোপ দাবী করত যে কাউকে সম্রাটের সিংহাসনে বসানো বা না বসানো সম্পূর্ণরূপে পোপের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। রাজারা স্বভাবতঃই এই দাবী মানতে অস্বীকার করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে রাজতন্ত্র ঈশ্বর-সৃষ্ট এবং পোপ সম্রাটের অধীন। এর ফলে পরবর্তীকালে পোপ এবং সম্রাটদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। চার্লসের অবশ্য এসব কোন সমস্যাই ছিল না। তাঁর বক্তব্য ছিল যে পোপ এবং যাজকগণের কাজ ধর্মচর্চা করা, আর রাজার কাজ শাসন করা।

---

*Thompson and Jhonson—An Introduction to Medieval Europe (300 AD—1500AD).

তিনি চার্চের রক্ষাকর্তা। প্রয়োজনে তিনি পোপকে নির্দেশ দিতে পারেন। অভিষেকের পরে চার্লস যাজক ও অন্যান্য প্রজাদের রোমান সম্রাটের নামে শপথ করিয়ে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন। চার্লসের নির্দেশে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান যাজকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়াও বিশপ মনোনয়ন, চার্চের সম্পত্তি দেখাশুনা, ধর্মীয় অধিবেশন আহ্বান, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মমতের ব্যাখ্যা প্রদান করা চার্লসের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এককথায় বলা চলে যে, তাঁর কাছে চার্চ ছিল সম্রাটের অধীনস্থ একটি বিভাগ এবং পোপ একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাত্র। পরবর্তীকালে পোপেরা প্রজাদের এতটা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি মানতে চাইতেন না। তাই নিয়ে পোপও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

**চার্লসের রাজসভা এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা**—চার্লস শুধু একজন রাজ্যবিজেতাই ছিলেন না, তিনি জ্ঞানী-গুণীর কদরও বুঝতেন। কয়েক শতক ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল না বললেই চলে। বেশীর ভাগ যাজকও ছিল অশিক্ষিত। চার্লস এই অবস্থার প্রতিকারে উদ্যোগী হলেন।

প্রথমে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে নামকরা সব পণ্ডিতদের তাঁর রাজসভায় আহ্বান জানালেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে এবং তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্বান ব্যক্তিরা এসে তাঁর সভা অলংকৃত করেন। চার্লস-এর রাজসভায় এলেন ইতালি থেকে পিটার ও পলিনাস, স্পেন থেকে থিওডাল্‌ফ, ফ্রান্স থেকে এ্যান্‌জিলবার্ট। সবার সেরা পণ্ডিত এ্যালকুয়িন এসেছিলেন ইয়র্ক থেকে। এইসব বিদ্বজ্জনের সঙ্গে জ্ঞান-চর্চায় চার্লস সময় অতিবাহিত করতেন।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য চার্লস্ তাঁর রাজপ্রাসাদে একটি বিদ্যালয় খুলেছিলেন। এ্যালকুয়িন ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান। সহজে শেখানোর জন্য কথোপকথনের ভঙ্গীতে ব্যাকরণ, ছন্দ, বানান-পদ্ধতি, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। লম্বার্ডির পল দি ডিকন লিখেছিলেন "লম্বার্ড জাতির ইতিহাস", পিটার ও পলিনাস দু'জনেই ছিলেন

বিশিষ্ট বৈয়াকরণ। থিওডাল্ফ ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত কবি। এঁরা সকলেই চার্লস প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চার্লসের জীবনচরিত লেখক এইন্‌হার্ড ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্র। রাজপরিবার ও অন্যান্য অভিজাত পরিবারের সন্তানরা এই বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করতেন।

যাজকদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য ক্যাথিড্রাল এবং মঠগুলিতেও বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। নির্ভুল গ্রন্থ যাতে লিখিত হয় সেদিকে চার্লসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যারা পুঁথি নকল করত তাদের উপযুক্ত বিদ্যা না থাকায় পুঁথিগুলি ছিল অজস্র ভুলে ভরা। সেণ্ট জেরোম কর্তৃক লাতিন ভাষায় অনূদিত বাইবেল ও প্রাচীন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের লিখিত ধর্মীয় রচনাগুলি নির্ভুলভাবে প্রস্তুত করার দায়িত্ব চার্লস 'পল দি ডিকনে'র উপর ন্যস্ত করেছিলেন। পুঁথি নকল করতে গিয়ে লিপিরও সংস্কার করা হ'ল। আগেকার হরফ বড় আকারের ও অপরিষ্কার ছিল। কিন্তু চার্লসের আমলের হরফগুলি হ'ল ছোট ও সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট। এই হরফগুলিকে বলা হল 'মাইনাস্‌কিউল'। এইভাবে বহু সুন্দর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

চার্লস শিল্পকলারও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি রাজধানী এ্যাচেন্ এবং অন্যান্য স্থানে সুরম্য প্রাসাদ এবং বিশাল ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর উৎসাহে এইভাবে স্থাপত্যে এক নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। একে বলে 'রোমানেস্ক রীতি'। অনেক নতুন শহরের পত্তন হয়েছিল। মেইন্‌জ নদীর উপরে নির্মিত ৫০০ গজ লম্বা সেতু তাঁর আমলের উন্নত ইন্‌জিনীয়ারিং শিল্পকলার পরিচয় প্রদান করে।

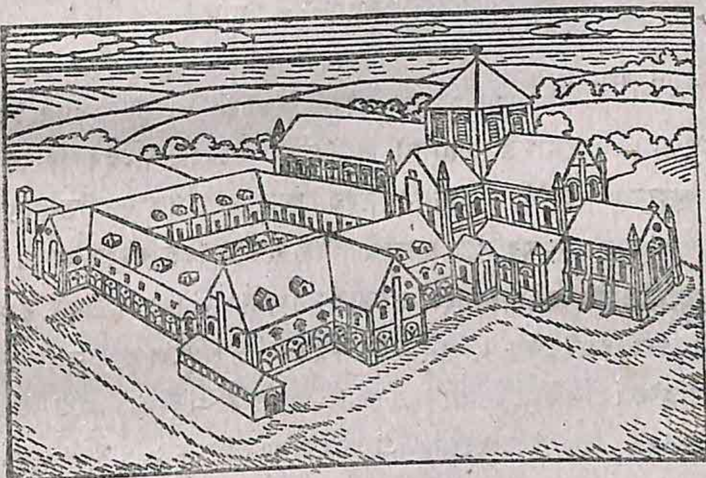
শার্লেমানের আমলে সাহিত্য ও শিল্পকলা নতুন রূপ পেয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা সংস্কৃতির এই বহুমুখী বিকাশকে 'ক্যারোলিঞ্জীয় নবজাগরণ' আখ্যা প্রদান করেন।

* * *

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠ-সংকেত—সাধু ও সন্ন্যাসীদের মঠ ● সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় ● সেণ্ট বেনেডিক্টের নির্দেশানুসারে মঠের জীবন ● শিক্ষার ক্ষেত্রে মঠের অবদান ● ক্লুনি-মঠ।

**সাধু ও সন্ন্যাসীদের মঠ**—খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ও যাজকগণের বাস করার জন্য পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে মঠ তৈরী হ'ল। মঠগুলি তৈরী হ'ত সাধারণতঃ লোকালয় থেকে দূরে নির্জন স্থানে। স্ত্রী ও পুরুষ সন্ন্যাসীদের মঠ ছিল পৃথক। গৃহত্যাগী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের বলা হ'ত মঙ্ক আর সন্ন্যাসিনীদের নান্। সন্ন্যাসীদের মঠ



আদর্শ মঠের পরিবেশ

'মনাষ্টারি' এবং সন্ন্যাসিনীদের মঠ 'নানারি' নামে পরিচিত ছিল। মঠের প্রধানকে বলা হ'ত এ্যাবট্। মঠের সন্ন্যাসীদের ভোটে এ্যাবট নির্বাচিত হতেন। প্রত্যেকটি মঠ ছিল স্বয়ং-শাসিত সংস্থা। প্রত্যেক এ্যাবট তাঁর মঠের জন্য পৃথক নিয়ম চালু করতেন।

**সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়**—মঠগুলিতে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা বাস করত। বর্বর উপজাতিদের আক্রমণের সময় নিরাপত্তার জন্য অনেকে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে মঠে বাস করতে আরম্ভ করেছিল।

প্রথমে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবনযাপনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সেণ্ট বেনেডিক্ট নামে জনৈক সন্ন্যাসী ইতালির নেপলসের অদূরে মণ্টি-ক্যাসিনোতে একটি আদর্শ মঠ স্থাপন করেন। তিনি তাঁর মঠের সন্ন্যাসীদের জন্য কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন করেন। অন্যান্য মঠও এই নিয়মগুলি গ্রহণ করে। ফলে মঠে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।



খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী

সেণ্ট বেনেডিক্টের নির্দেশানুসারে মঠের জীবন—বেনেডিক্ট নিয়ম করেছিলেন যে প্রত্যেক মঠবাসী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে তিনটি শপথ নিতে হবে। সেগুলি হ'ল—(১) দরিদ্র জীবনযাপন, (২) সৎ জীবন অনুসরণ ও (৩) এ্যাবটের প্রতি আনুগত্য। বেনেডিক্ট সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের আচরণ বিধিও প্রস্তুত করেছিলেন। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা চলবে না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

বেনেডিক্টের নিয়মানুসারে প্রত্যেক মঠবাসী পাশাপাশি একই রকম ঘরে থাকত এবং একইরকম আহার্য গ্রহণ করত। শীতকালে রাত সাড়ে তিনটায় উঠতে হ'ত। সকলকে প্রার্থনা, ধ্যান, গ্রন্থপাঠ প্রভৃতির জন্যে বেনেডিক্ট নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যেককে ৬/৭ ঘণ্টা কায়িক শ্রম করতে হ'ত। খাদ্যের মান অতি সাধারণ হলেও প্রত্যেকেই ক্ষুধা মেটানোর উপযোগী খাদ্য পেত। যারা অসুস্থ বা বৃদ্ধ তাদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হ'ত। মোটের উপর মঠের জীবন ছিল সরল, অনাড়ম্বর এবং কষ্টের। তবে এই কষ্ট মঠবাসীদের অসহনীয় ছিল না।

**শিক্ষার ক্ষেত্রে মঠের অবদান**—পশ্চিম ইউরোপে মঠগুলি ছিল শিক্ষার ধারক ও বাহক। পুরানো পুঁথি নকল করা ছিল সন্ন্যাসীদের অন্যতম কাজ। সেইজন্য প্রতি মঠেই পুঁথির অনুবাদের জন্য আলাদা ঘর থাকত। তাকে বলা হ'ত 'স্ক্রিপ্‌টোরিয়া'। এইসব পুঁথি মঠে যত্নে রক্ষিত থাকত বলেই পরবর্তী-কালে সেইসব পুঁথি থেকে মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ

করা হয়েছে। প্রত্যেক মঠেই বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। সাধারণ সন্ন্যাসীদের অনেকেই এইসব বিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন সুশিক্ষক ও সুলেখক। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে এইসব সন্ন্যাসীদের অবদান যথেষ্ট।

ক্লুনি মঠ—৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বার্গাণ্ডির অন্তর্গত ক্লুনিতে একটি মঠ স্থাপিত হয়। কয়েকজন নামকরা এ্যাবটের নেতৃত্বে আদর্শ মঠ হিসেবে ক্লুনির সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্লুনি মঠের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মঠ ক্লুনি মঠের এ্যাবটের নেতৃত্ব মেনে নেয়। এইভাবে ক্লুনি মঠ ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

শার্লেমানের মৃত্যুর পর ইউরোপে আবার এক অরাজক অবস্থা দেখা দেয়। প্রতিটি অঞ্চলে ভূস্বামী শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এইসব শক্তিশালী সামন্তরা মঠগুলিকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার বিনিময়ে গুণ বিচার না করে নিজেদের লোককে মঠের এ্যাবটরূপে নিয়োগ করতে আরম্ভ করে। এইরূপে মঠগুলি হয়ে ওঠে তাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র। জমিদারেরা প্রায়ই সন্ন্যাসীদের জমি-জমা, ধন-দৌলত উপহার দিতেন। তার ফলে সন্ন্যাসীরা অনেকেই অসংযত ভোগী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল শৃঙ্খলাবোধের অভাব।

মঠগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য ক্লুনির ধর্মসংস্কারকগণ সেন্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলী পুনরায় কঠোরভাবে চালু করেছিলেন। তাঁদের সংস্কার আন্দোলনে যেসব বিষয় প্রধানতঃ স্থান পেয়েছিল তা হল—যাজকদের বিবাহ থেকে বিরত থাকা, যাজক ও সন্ন্যাসীদের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নত করা, জমিদার এবং রাজার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ কর্তৃক মঠাধ্যক্ষ নির্বাচন করা, চার্চের জমি-জমা ও সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার সন্ন্যাসীদের দায়িত্বে ন্যস্ত করা প্রভৃতি।

ক্লুনি মঠের সন্ন্যাসীরা মঠে জমিদারদের কর্তৃত্ব বরদাস্ত করলেন না। তাঁরা নিজেরাই এ্যাবট নির্বাচন করেছিলেন। ক্লুনির এ্যাবট পোপ ছাড়া তাঁরা আর কারও অধীনতা স্বীকার করলেন না। এইভাবে মঠে সামন্তদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার চেষ্টা করা হ'ল। এই সংস্কার আন্দোলনের মূল

উদ্দেশ্যই ছিল রাজা ও জমিদার শ্রেণীর কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে মঠগুলিকে স্বয়ংশাসিত সংস্থাতে পরিণত করা এবং সন্ন্যাসীদের পবিত্র নির্লোভ জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত করা।

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ বার্গাণ্ডি থেকে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে ছাড়িয়ে পড়ে।

* * *

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠ-সংকেত—ইনভেষ্টিচার প্রসঙ্গে দ্বন্দ্ব।

**ইনভেষ্টিচার প্রসঙ্গে দ্বন্দ্ব**—ইনভেষ্টিচার প্রশ্ন নিয়ে পোপ এবং জার্মান সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব মধ্যযুগীয় ইউরোপের একটি অন্যতম ঘটনা।

দশম শতকে প্রথম অটোর সময় থেকেই জার্মানীতে চার্চ এবং সম্রাটের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কোন বিশপ এবং এ্যাবট নতুন পদ গ্রহণের আগেই সম্রাটকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিত। সম্রাট বিশপ বা এ্যাবটের হাতে একটি দণ্ড এবং একটি আংটি প্রদান করতেন। এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে বলা হ'ত 'ইনভেষ্টিচার'। এইরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চার্চ সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীতে 'ইনভেষ্টিচার' প্রশ্ন নিয়ে সম্রাট ও পোপের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম গ্রেগরী পোপ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ক্লুনি মঠের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। চার্চকে সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তিনি ঘোষণা করলেন যে কোন রাজার পক্ষে কোন বিশপ বা এ্যাবটকে নির্বাচিত করা সম্পূর্ণ বে-আইনি; রাজা বা বিশপ—যে তাঁর আদেশ অমান্য করবে তাকেই বহিষ্কৃত করা হবে। জার্মানীর সম্রাট চতুর্থ হেনরী পোপের আদেশ মেনে তো নিলেনই না উপরন্তু ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে পোপকে অভিযুক্ত করলেন। চতুর্থ হেনরীকে সমর্থন জানাল জার্মানীর যাজকবৃন্দ। পোপ

গ্রেগরীও থেমে রইলেন না। তিনি চতুর্থ হেনরীকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন। পোপের নির্দেশে জার্মানীর চতুর্দিকে চতুর্থ হেনরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। উপায়ান্তর না দেখে জার্মান সম্রাট ক্যানোসাতে হাজির হয়ে পোপের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন; পোপ তাঁকে ক্ষমা করলেন এবং ক্ষমতাচ্যুতির আদেশ তুলে নিলেন। এইভাবে ইনভেষ্টিচার প্রশ্ন নিয়ে লড়াই-এ পোপ সপ্তম গ্রেগরী জয়ী হলেন। কিন্তু এর পরেও দীর্ঘদিন পোপ এবং সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছিল। অবশেষে ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্মস্ নগরীর অধিবেশনে ইনভেষ্টিচার প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল। ঠিক হল যে, নতুন বিশপ বা এ্যাবট আংটি ও দণ্ড গ্রহণ করবে চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে। তবে রাজার উপস্থিতিতে ও সম্মতিতে চার্চের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এইভাবে ইনভেষ্টিচার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছিল।

* * *

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠ-সংকেত—একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বিদ্যাচর্চা ● বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ● কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ● ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ● বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন।

**একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বিদ্যাচর্চা**—একাদশ শতকের শেষভাগ থেকে পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপকভাবে বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। তার ফলে দ্বাদশ শতকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হয়। পণ্ডিতগণ সংস্কৃতির এই বিকাশকে 'দ্বাদশ শতকের নবজাগরণ' নামে অভিহিত করেছেন।

**বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব**—শার্লেমানের আমল থেকে মঠ এবং ক্যাথিড্রাল-গুলি ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। একাদশ শতকে ও দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে কয়েকটি ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন হয়েছিল। তার প্রভাবে মঠগুলি বিদ্যাচর্চা থেকে ধর্মের উন্নতির দিকে বেশী নজর দেয়। কিন্তু ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল। ক্যান্টারবেরি,

লিঁয়, রেইস্, প্যারিস, সাত্রেজ, টলেডো প্রভৃতি স্থানের ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয়গুলি ছিল নামকরা। বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এসে ভীড় করে। এইভাবে অনেক ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয় সম্প্রসারিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত—একাদশ-দ্বাদশ শতকে ইউরোপে বেশ কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আনসেলম্, রোসেলিন, আবেলার্ড, সেণ্ট বার্ণার্ড, প্যারিসের বিশপ পিটার দি লম্বার্ড, এ্যালবার্টাস ম্যাগনাস, টমাস এ্যাকুইনাস, রজার বেকন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ্য। কৃতী শিক্ষক হিসাবে আবেলার্ডের নাম এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে ছাত্র প্যারিসে তাঁর কাছে ধর্মতত্ত্ব ও তর্কবিদ্যা শিখতে আসত।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক—প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ বলতে কিছু ছিল না। অনেক সময় শিক্ষকের বাড়ীতে অথবা ভাড়া করা বাড়ীতে ক্লাস হ'ত। শিক্ষকেরা ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক পড়তেন এবং পঠিত অংশের ব্যাখ্যা করে দিতেন। ছাত্ররা চুপচাপ মন দিয়ে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনত। ছাত্রেরা মেঝেতে খড় বিছিয়ে তার উপরে বসতো। শিক্ষকেরা খুব ধীরে ধীরে পড়াতেন। তার ফলে মনোযোগী ছাত্রদের শিক্ষকের বক্তৃতার প্রতি অক্ষর টুকে নিতে কোন অসুবিধা হ'ত না। পড়াশুনা শেষ হলে ছাত্রকে ডিগ্রী দেওয়া হ'ত। ছাত্র তখন শিক্ষকদের জন্য এক ভোজের আয়োজন করত। পরীক্ষার্থী ছাত্র শিক্ষকের সদয় দৃষ্টিলাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকত।

তখনকার দিনের ছাত্ররা মোটেই শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল না। তাদের মধ্যে মারামারি প্রায় লেগেই থাকত। প্রায়ই তারা পার্শ্ববর্তী শহরে গিয়ে উপদ্রব করত।

## ॥ বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন ॥

একাদশ-দ্বাদশ শতকে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা সম্পর্কে চর্চা আরম্ভ হয়।

**চিকিৎসা-শাস্ত্র**—পশ্চিম ইউরোপে চিকিৎসা শাস্ত্র বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসক গ্যালেন ও হিপ্পোক্রেটসের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলি এক সময়ে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। আরবি থেকে আবার সেগুলি লাতিন ভাষায় পুনরায় অনুবাদ করা হ'ল। অনুবাদের মাধ্যমে আরবি চিকিৎসক আভিচেন্নার গ্রন্থগুলির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপ পরিচিত হ'ল। কিন্তু চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান শুধুমাত্র পুঁথিগত চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষার সময়ে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে জ্ঞান অর্জনের সুযোগসুবিধা ছিল না। তাই চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায় অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে যেত। দক্ষিণ ইতালির স্যালার্নো বিদ্যালয় চিকিৎসা-বিদ্যা শেখানোর অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল।

**আইন শাস্ত্র**—'কোড্ অব্ জাষ্টিনিয়ন' ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রায় ছ'শ বছর পশ্চিম ইউরোপে এই গ্রন্থের কোন আদর ছিল না। ক্রমশঃ রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি ও নগরীর উদ্ভবের ফলে একাদশ-দ্বাদশ শতকে রোমান আইনের মর্যাদা পুনরায় স্বীকৃত হ'ল। তখন আইনজ্ঞদের চাকরী পাওয়া সহজ ছিল। তাই দলে দলে ছাত্র এগিয়ে এল আইন শাস্ত্র পড়তে। পোপেরও এই সময় ছিল প্রবল প্রতাপ। সুতরাং ধর্মীয় আইনেরও খুব কদর ছিল। গ্রেসিয়ান বাইবেল ও পোপদের বিভিন্ন সময়ের ঘোষণাকে ভিত্তি করে 'ডিক্রীটাম' নামে একটি ধর্মীয় আইন গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ধর্মীয় আইন-শাস্ত্র পাঠেও ছাত্রদের উৎসাহিত করেছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতকে রোমান আইনের একজন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা ছিলেন ইরনেরিয়াস্। তাঁর জন্যই ইতালির অন্তর্গত বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় রোমান আইন শিক্ষার কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে।

**ধর্মতত্ত্ব**—ধর্মতত্ত্ব প্রথমতঃ খ্রীষ্টান ধর্মকে জানতে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। তাই ধর্মতত্ত্ব ছিল মধ্যযুগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। একাদশ-দ্বাদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রধানতঃ এই বিষয় নিয়ে চর্চা করত। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মতত্ত্ব আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে নাম করেছিল। মধ্যযুগের শুরু থেকে বহু সন্ন্যাসী ও ধার্মিক ব্যক্তি খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তাঁদের বক্তব্য এতকাল অভ্রান্ত বলে সকলে মেনে আসছিল। পিটার আবেলার্ড 'সিক্-এট-নন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি আগেকার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলির পারস্পরিক বিরোধী বক্তব্যের আলোচনা করেন। পিটার লম্বার্ড নামে অপর একজন পণ্ডিত 'সেন্টেন্সেস্' নামক গ্রন্থে এইসব বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছিলেন। এ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন টমাস এ্যাকুইনাস। তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে মোট আঠারোখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সুম্মা থিওলোজিয়া।

তর্কশাস্ত্র—গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্তোতলের দর্শন গ্রন্থগুলির কিছু কিছু আগেই লাতিনে অনুবাদ হয়েছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতকে তাঁর বাকী গ্রন্থগুলিকেও লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হ'ল। এ্যারিস্তোতলের গ্রন্থ পড়ে লোকে জানতে পারল যে কিভাবে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায়। পিটার আবেলার্ড এ্যারিস্তোতলের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রচিত 'ডায়ালেক্টিকা' নামক গ্রন্থ তর্কশাস্ত্রের উপর নতুন আলোকপাত করে।

কলাবিদ্যা—মধ্যযুগে সাতটি বিষয়কে কলা বিদ্যার অন্তর্গত ধরা হ'ত। প্রথম ভাগে পড়ান হ'ত তিনটি বিষয়—ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র একে বলা হ'ত ট্রিভিয়াম। আর দ্বিতীয় ভাগের পাঠ্যতালিকায় ছিল অঙ্ক, জ্যামিতি, সঙ্গীত ও জ্যোতির্বিদ্যা। সংক্ষেপে একে বলা হ'ত কোয়াড্রিভিয়াম। পদার্থ বিজ্ঞান, ছন্দ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে এ্যারিস্তোতল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রীক থেকে এই গ্রন্থগুলি লাতিনে অনূদিত হ'ল। ইউক্লিডের জ্যামিতির সঙ্গেও পশ্চিম-ইউরোপ প্রথম পরিচিত হ'ল অনুবাদের মাধ্যমে। এছাড়াও আরবি পণ্ডিতদের লিখিত বীজগণিত, জ্যামিতি বিষয়ক গ্রন্থগুলির লাতিনে অনুবাদ হয়েছিল। আরবি সংখ্যাতত্ত্ব এমনকি শূন্য পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে একাদশ শতকে প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল। লাতিন ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ এইভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিল।

**বিজ্ঞান চর্চা**—মধ্যযুগে রোজার বেকন প্রথম বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করেন। তিনি বলতেন যে যুক্তি দিয়ে বিচার করে সব কিছু গ্রহণ করা উচিত। তিনি সৃষ্টি বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর গবেষণা দ্বারা নতুন আলোকপাত করেন।

**সাহিত্য**—দ্বাদশ শতকে নতুন রীতিতে লাতিন ভাষায় বহু কবিতা রচিত হয়। কবিতায় বিভিন্ন প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হয়। এই সময়ে একদল কবি বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করে। এই কবির দল নিজেদের 'গোলিয়ার্ড' ( গোলিয়াসের শিষ্য ) বলে পরিচয় দিত। এ-ছাড়াও পুরানো রীতির প্রভাবমুক্ত অনেক সুন্দর ধর্মীয় কবিতা এই সময়ে লিখিত হয়। লাতিন ভাষায় লিখিত কবিতায় এক নতুন ধরনের ছন্দ প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই ছন্দের নাম 'সিকোয়েন্স'। প্যারিসের সেণ্ট-ভিক্টর মঠের সন্ন্যাসী এ্যাডামের 'সিকোয়েন্স' ছন্দের ব্যবহার সকলকে চমৎকৃত করে।

নাটকের ক্ষেত্রেও পুরানো পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয়। বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ও নিউ টেষ্টামেণ্টের বিভিন্ন গল্প অবলম্বনে নাটক লিখিত হয়। এই নাটকগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) রহস্য নাটক ও (২) অলৌকিক নাটক।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

(১) শার্লেমানের সাম্রাজ্যের আয়তন কি ছিল? (২) কিভাবে চার্লস পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন? (৩) শার্লেমান প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে কেন আধুনিক ঐতিহাসিকেরা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন না? (৪) শার্লেমানের অভিষেকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। (৫) পোপের সঙ্গে চার্লসের সম্পর্ক কিরূপ ছিল? (৬) চার্লস শিক্ষা সংস্কারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কেন? (৭) নির্ভুল গ্রন্থ যাতে লেখা হয় সেইজন্য চার্লস কি করেছিলেন? (৮) শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক রূপে চার্লসের পরিচয় প্রদান কর। (৯) শিক্ষার ক্ষেত্রে মঠের অবদান কি? (১০) সেণ্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলী সম্পর্কে লেখ। (১১) ক্লুনি মঠ ধর্মীয় ক্ষেত্রে কি

ভূমিকা গ্রহণ করেছিল? (১২) ইনভেস্টিচার কাকে বলে? ইনভেস্টিচার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে যা জান লেখ। (১৩) কিভাবে মধ্যযুগের ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্ভব হয়েছিল? (১৪) একাদশ-দ্বাদশ শতকে ইউরোপে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্পর্কে কিভাবে ছাত্ররা জ্ঞান লাভ করত? (১৫) মধ্যযুগের আইনশাস্ত্র চর্চা সম্বন্ধে কি জান? (১৬) ধর্মতত্ত্ব কাকে বলে? মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মতত্ত্ব চর্চার বিবরণ দাও। (১৭) ইউরোপে মধ্যযুগে কলাবিদ্যার অনুশীলন সম্পর্কে যা জান লেখ। (১৮) একাদশ-দ্বাদশ শতকে ইউরোপীয়দের সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে কি জান?

**সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ** (১) শার্লেমানের সিংহাসনে আরোহণের ফলে জার্মান জাতির মর্যাদা কেন বৃদ্ধি পেয়েছিল? (২) শার্লেমানের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার ফলে কেন পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আলাদা হয়ে গেল? (৩) রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্ক সম্বন্ধে পোপের ধারণা কি ছিল? (৪) এ্যালকুইনের অবদান সম্পর্কে লেখ। (৫) চার্লসের আমলে হরফ সংস্কার সম্পর্কে লেখ। (৬) 'ক্যারোলিঞ্জীয় নবজাগরণ' কাকে বলে? (৭) মধ্যযুগের খ্রীষ্টান-মঠ কি ধরনের ছিল? (৮) মঠগুলিতে কারা থাকত? ক্লুনি মঠের সন্ন্যাসীরা কিভাবে মঠে সামন্তদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করেছিলেন? (৯) 'ইনভেস্টিচার' অনুষ্ঠান সম্পর্কে লেখ। (১০) পোপ সপ্তম গ্রেগরীর সঙ্গে জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর বিরোধ কেন বেঁধেছিল? (১১) 'দ্বাদশ শতকের নবজাগরণ' কাকে বলে? (১২) ইউরোপের কোন্ কোন্ স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল? (১৩) বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় রোমান আইনশিক্ষার কেন্দ্ররূপে কেন খ্যাতি অর্জন করে? (১৪) গ্রীক দার্শনিক এ্যরিস্তোতলের দর্শন গ্রন্থ পড়ে লোকে কি জানতে পারল? (১৫) রোজার বেকন কি কারণে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন? (১৬) সিকোয়েন্স ছন্দ সম্পর্কে কি জান?

## বিষয়মুখী প্রশ্ন

**এক কথায় উত্তর দাও ঃ** (১) জার্মান উপজাতিদের মধ্যে কোন্ জাতি ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী? (২) শার্লেমানের পিতার নাম কি? (৩) হাঙ্গেরীর কোন্ জাতি চার্লসকে তাদের অধিপতিরূপে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল? (৪) কত খ্রীষ্টাব্দে চার্লস 'পবিত্র রোমান সম্রাট' পদে অভিষিক্ত হলেন? (৫) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি? (৬) রোমান জনসাধারন কেন পূর্ব রোমান সম্রাটের প্রতি অনুরক্ত ছিল না? (৭) শার্লেমানের সময় সবার সেরা পণ্ডিত কে ছিলেন? (৮) এ্যাবট কাদের বলা হত? (৯) "লম্বার্ড জাতির ইতিহাস" কে লিখেছিলেন? ১০ শিক্ষা বিস্তারের জন্য চার্লস কোথায় বিদ্যালয় খুলেছিলেন? (১১) পলিনাস

কে ছিলেন? (১২) চার্লসের রাজধানীর নাম কি ছিল? (১৩) চার্লসের রাজসভায় ফ্রান্স থেকে কে এসেছিলেন? (১৪) সেণ্ট বেনেডিক্ট কোথায় আদর্শ মঠ স্থাপন করেছিলেন? (১৫) কোন্ পোপের সময়ে ইনভেষ্টিচার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়? (১৬) কোথায় ইনভেষ্টিচার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা হল? (১৭) আনসেলম্ কে ছিলেন? (১৮) লাতিন ভাষায় যেসব গ্রীক চিকিৎসকদের গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছিল তাদের নাম কি? (১৯) টমাস এ্যাকুইনাসের সবচেয়ে নামকরা গ্রন্থের নাম কি? (২০) 'ট্রিভিয়াম্' বলতে কোন বিষয়গুলিকে বোঝাত?

শূন্যস্থান পূরণ কর:

(১) ——জাতিকে পরাজিত করা চার্লসের রাজত্বে অন্যতম ঘটনা। (২) লম্বার্ডির রাজা —— হারিয়ে দিয়ে চার্লস নিজেকে লাম্বার্ডির রাজা বলে ঘোষণা করেন। (৩) পোপ —— চার্লসের মাথায় রাজকীয় মুকুট স্থাপন করেন। (৪) জাতিতে শার্লেমান ছিলেন ——। (৫) চার্লসের জীবনচরিত রচয়িতা —— এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। (৬) মঠের প্রধান বলা হ'ত ——। (৭) প্রতি মঠে পুঁথি অনুবাদের জন্য রাখা আলাদা ঘরকে বলা হত ——। (৮) —— খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম গ্রেগরী পোপ পদে অভিষিক্ত হন। (৯) পোপ সপ্তম গ্রেগরী —— ক্ষমতাচ্যুত করলেন। (১০) দশম শতকে —— সময় থেকেই জার্মানীতে চার্চ এবং সম্রাটের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। (১১) ——বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মতত্ত্ব আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে নাম করেছিল। (১২) দক্ষিণ ইতালির —— বিদ্যালয় চিকিৎসা-বিদ্যা শেখানোর অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। (১৩) —— 'সিক-এট-নন্' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। (১৪) —— সঙ্গেও পশ্চিম ইউরোপ প্রথম পরিচিত হ'ল অনুবাদের মাধ্যমে। (১৫) প্যারিসের সেণ্টভিক্টর মঠের সন্ন্যাসী —— সিকোয়েন্স ছন্দের ব্যবহার সকলকে চমৎকৃত করে। (১৬) মধ্যযুগের নাটকগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয় —— ও ——।

**ডানদিকে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও।**

(১) চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ( ৭৬৮ খ্রীঃ / ৭৮০ খ্রীঃ / ৮০০ খ্রীঃ )।

(২) থিওডালফ্ ছিলেন একজন ( কবি / সঙ্গীতজ্ঞ / কূটনীতিক )।

(৩) চার্লস যে বিদ্যালয় খুলেছিলেন তার প্রধান ছিলেন ( পিটার / পলিনাস / এ্যালকুইন )।

(৪) ক্লুনি মঠটি ছিল ( ইংলণ্ডে / জার্মানীতে / বার্গাণ্ডিতে )।

(৫) সপ্তম গ্রেগরীর উদ্দেশ্য ছিল ( সিংহাসন দখল করা / চার্চের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করা / চার্চকে সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের প্রভাব থেকে মুক্ত করা )।

(৬) পোপ সপ্তম গ্রেগরী ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন ( শার্লেমানকে / চতুর্থ হেনরীকে/ দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে )।

(৭) পোপ সপ্তম গ্রেগরীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য জার্মান সম্রাট হাজির হয়েছিলেন ( রোমে / ক্যানোসাতে / বার্গাণ্ডিতে )।

(৮) ইরনেরিয়াস ছিলেন ( একজন কবি / একজন চিকিৎসক / একজন আইনের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা )।

(৯) 'ডিক্রীটাম' নামে ধর্মীয় আইনগ্রন্থ রচনা করেন (গ্রেসিয়ান / ইরনেরিয়াস / দান্তে )।

(১০) পিটার লম্বার্ড যে গ্রন্থ লিখেছেন তার নাম ( ডিক্রীটাম / সেণ্টেন্সেস্ / সিক-এট-নন্ )।

(১১) এ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের সুযোগ্য ছাত্র ( আনসেলম্ / সেণ্ট বার্নার্ড / টমাস এ্যাকুইনাস )।

(১২) মধ্যযুগে কলাবিদ্যার অন্তর্গত বিষয় ছিল ( সাতটি / তিনটি / চারটি )।

(১৩) মধ্যযুগে প্রথম বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করেন ( টমাস এ্যাকুইনাস / রোজার বেকন / আবেলার্ড )।

(১৪) গোলিয়ার্ড বলা হত ( একদল শিল্পীকে / একদল কবিকে / একদল সঙ্গীতজ্ঞকে )।

**ভুল বাক্যকে ঠিক করে লেখ :** (১) স্যাক্সন জাতিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জন্য চার্লস মোট দশবার অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। (২) ব্যাভেরিয়া, ডাচি চার্লস অধিকার করেছিলেন সমগ্র ফ্রান্সকে তাঁর অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। (৩) চার্লসের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে যাজকেরা অধ্যয়ন করত। (৪) 'মাইনাসকিউল' চার্লসের আমলের এক ধরনের শিল্পরীতি। (৫) ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লুনি মঠটি স্থাপিত হয়। (৬) খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠকে নানারি বলা হ'ত। (৭) চতুর্থ হেনরীকে সমর্থন জানিয়েছিল ইতালির যাজকবৃন্দ। (৮) প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় রোমান আইন শিক্ষার কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করে। (৯) এ্যারিস্তোত্‌ল 'ডায়ালেকটিকা' গ্রন্থের লেখক। (১০) পিটার লম্বার্ড রচনা করেন গ্রীসের ইতিহাস। (১১) 'সিকোয়েন্স' একপ্রকার সঙ্গীত।

সপ্তম অধ্যায়

# মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

**পাঠ-সংকেত**—সামন্ততন্ত্র ● একের সঙ্গে অপরের জমিকেন্দ্রিক সম্পর্ক ● সামন্ততান্ত্রিক সমাজে স্তরভেদ ● সামন্তশ্রেণীর ক্ষমতা দখল ● ফিউডাল প্রাসাদ ও অশ্বারোহী যোদ্ধা ● সামন্ততান্ত্রিক যুগের জীবনযাত্রা ● সিভালরী সংগঠন ● ক্রুসেড ● ম্যানরিয়াল প্রথা ● সামন্ততন্ত্রে অর্থনৈতিক ভিত্তি ● ম্যানর—সামন্ততান্ত্রিক যুগের শাসনের প্রথম ধাপ ● ম্যানরের বিচারালয় ● অর্থনৈতিক অবস্থা ● শস্য উৎপাদনে গ্রামীন কৃষক ● চাষীদের প্রচণ্ড শ্রম ও প্রচুর কর প্রদান ● চাষীদের জীবনযাত্রা ● জমিদার ও চার্চকে চাষীদের প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের কর ● ম্যানরস্থিত জমিদার বাড়ীর জীবনযাত্রা ● তিনটি শ্রেণী ● জমিদার ও সার্ফ—বিপরীত শ্রেণীভুক্ত ● 'সার্ফ'—জমিদারের সম্পত্তিস্বরূপ ● বংশানুক্রমিক ভূমি-দাসত্ব ● মুক্তির উপায়—সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ ● ধর্মযুদ্ধে যোগদান ● শহরে পলায়ন ● ব্যবসায় বৃত্তি ও শিল্প উৎপাদন ● সার্ফদের বিদ্রোহ।

শার্লেমান বাহুবলে নবম শতকে পশ্চিম ইউরোপের এক বিশাল অংশ জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বংশধরেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে মেতে রইল। এর ফলে অল্প কিছু-দিনের মধ্যে এই সাম্রাজ্যের পতন হল। চারদিকে দেখা দিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। এই সময়ে আবার বাইরের শত্রুর আক্রমণে জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত হল। প্রথম আক্রমণ করে নর্থম্যান বা নর্ম্যানরা। তারপর দানিয়ুব অঞ্চল থেকে ম্যাগিয়ার, উত্তর আফ্রিকা থেকে মুসলমান জলদস্যুর দল একের পর এক পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাতে থাকে। এইসব জাতির আক্রমণে ইউরোপের সে এক বেসামাল অবস্থা! প্রতিপদে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। আগেকার রাস্তা-ঘাটগুলি, মেরামতের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই এক অঞ্চলের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। দেশের রাজা গ্রাম থেকে বহুদূরে রাজধানীতে বাস করেন। গ্রামের মানুষের পক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন। তাছাড়া রাজার সেই আগেকার মত প্রবল প্রতাপ আর নেই। অতএব সহায়-সম্বলহীন সাধারণ মানুষ আর কি করবে? তারা স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোকেদের কাছে গিয়ে আশ্রয়

চাইল। এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অনেকেই ছিলেন রাজার অধীনস্থ ডিউক, কাউন্টি, ভাইকাউন্ট, ব্যারন নামধারী সরকারী আমলা। দেশের রাজার দুর্বলতার সুযোগে এরা প্রত্যেকে নিজের নিজের এলাকায় স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। তারাও অরাজকতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। এইসব স্বাধীন জমিদার বা সামন্তদের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নতুন করে গড়ে উঠে। পুনর্গঠনের নতুন রীতিকে ফিউডাল প্রথা বা সামন্ততন্ত্রের যুগ বলা হয়। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছিল। তথাপি নবম শতকে এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। সেই কারণে নবম শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসকে বলা হয় সামন্ততন্ত্রের যুগের ইতিহাস'।

একের সঙ্গে অপরের জমিকেন্দ্রিক সম্পর্ক—আগেই বলা হয়েছে যে বাইরের হানাদারদের আক্রমণে পথ-ঘাট সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সর্বত্রই চলছিল ব্যাপক অরাজকতা। এই অবস্থায় ইউরোপের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছেড়ে দিয়েছিল। জমি চাষ হয়ে উঠল তাদের একমাত্র জীবিকা। জমির মালিকেরা কৃষকদের মধ্যে তাদের জমির কিছু অংশ টুকরো করে ভাগ করে দিল এই শর্তে যে তারা বিনা মজুরীতে জমিদারের জমি চাষ করে দেবে। এইভাবে প্রজারা কায়িক শ্রম করে যে ফসল উৎপন্ন করত, জমিদার কোন পারিশ্রমিক না দিয়েই তাতে ভাগ বসাত। সে যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার নগদ টাকাকড়ির তেমন প্রচলন ছিল না। তাই নগদ অর্থে বেতন দিয়ে সৈন্যসামন্ত রাখা রাজা বা জমিদারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং রাজা জমিদারদের জমি দান করার সময় সর্ত করে নিতেন যে যুদ্ধের সময় তারা রাজাকে নিজেদের সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করবে। আবার জমিদারেরাও কৃষকদের জমি দানের সময় ঐ একই রকম সর্ত করে নিত। তার ফলে জমিদার আদেশ করলেই প্রজারা তার সঙ্গে যুদ্ধে যেত। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সকলেই এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল। সুতরাং

মধ্যযুগে একের সঙ্গে অপরের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাতে জমিই ছিল একমাত্র বন্ধন।

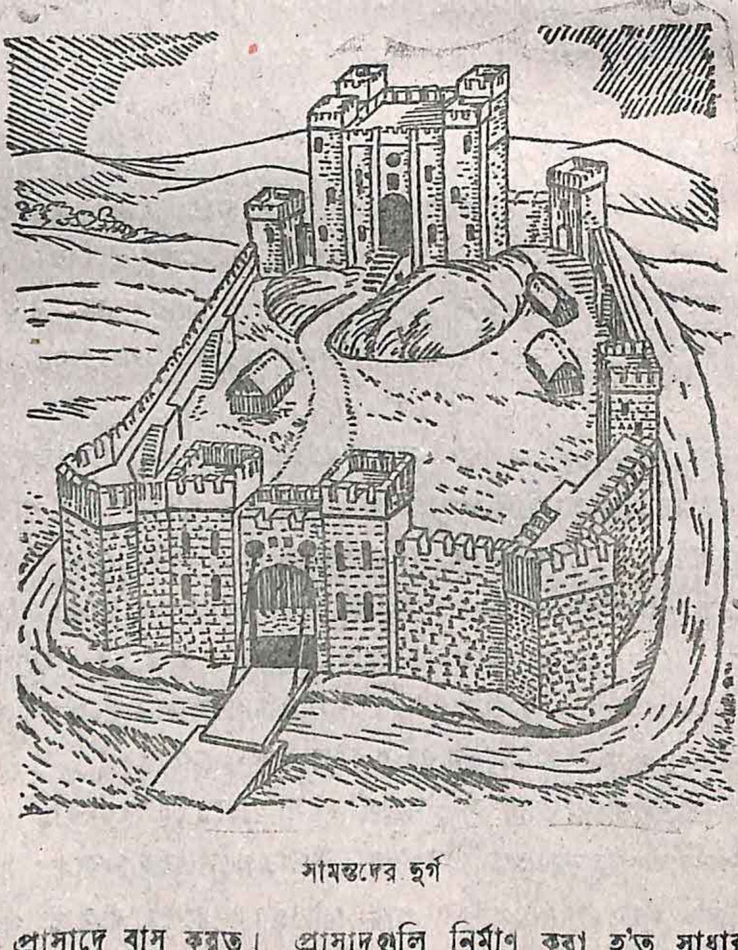
সামন্ততান্ত্রিক সমাজে স্তর ভেদ—রাজ্যে রাজা ছিলেন সকল জমির মালিক। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক যুগে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় জমিদার এবং সকলের উপরে তাঁর স্থান। ডিউক এবং আর্ল শ্রেণীর লোকেরা সরাসরি রাজার কাছ থেকে বিশাল ভূখণ্ড জমিদারী হিসেবে লাভ করত। এর বিনিময়ে তারা রাজাকে সামরিক অসামরিক সব ব্যাপারে সাহায্য করত। এই শ্রেণীকে বলা হয় সামন্ত। বড় জমিদাররা আবার তাদের জমিদারী উপসামন্ত বা মাঝারি জমিদারদের মধ্যে বণ্টন করে দিত। এই উপসামন্ত শ্রেণীকে বলা হত ব্যারন। সার্ফ বা চাষীরা ছিল সমাজের সবচেয়ে নীচের তলায়। তারা জমি পেত নাইটদের কাছ থেকে। সাধারণতঃ বিশ-ত্রিশটি গ্রাম নিয়ে ছিল-এদের জমিদারী। তারা আবার তাদের জমিদারী ছোট ছোট গ্রাম্য জমিদারদের মধ্যে ভাগ করে দিত। এই ছোট জমিদারদের বলা হত নাইট। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিন্যাস ছিল পিরামিডের মত। সবচেয়ে নীচের ধাপের যারা জমিদার অর্থাৎ নাইটরা ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যত উপরের ধাপে উঠা যায় জমির মালিকের সংখ্যাও তত কমে যায়।

একমাত্র রাজাকে বাদ দিয়ে সকল স্তরের জমিদারই তার উর্ধ্বতন স্তরের জমিদারের প্রজা। প্রজাকে তার উর্ধ্বতন প্রভুর আদেশ পালনে বাধ্য থাকতে হত। এর ফলে জমিদারদের প্রত্যেকেই একমাত্র তার উপরওয়ালা সামন্তপ্রভু ছাড়া আর অন্য কোন জমিদারের আনুগত্য স্বীকার করত না। তাই রাজার সঙ্গে বড় জমিদার ছাড়া অন্য স্তরের জমিদারের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ ছিল না। প্রত্যেক জমিদারই মনে করত যে তার নিজস্ব প্রজার সঙ্গে তার উর্ধ্বতন প্রভুর কোন সম্পর্ক নেই।

সামন্তশ্রেণীর ক্ষমতা দখল—আগেই বলা হয়েছে যে তখনকার দিনে ইউরোপে রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে এক অঞ্চলের সঙ্গে অপর অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন। দেশের রাজার পক্ষে বিভিন্ন এলাকা শাসন করা সম্ভবপরও ছিল না। তাছাড়া সামন্ততান্ত্রিক

সমাজ-ব্যবস্থায় রাজার সঙ্গে প্রজার প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের কোন সুযোগ ছিল না। নামে দেশের অধীশ্বর হলেও রাজার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। এই অবস্থায় সুযোগ নিয়ে সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় ছোট ছোট রাজা হয়ে বসেছিল। বাইরে থেকে শত্রু আক্রমণ করলে তারাই প্রজাদের রক্ষা করত। রাজার হয়ে তারাই কর আদায় করত এবং তাদের উপর ছিল নিজ নিজ এলাকার বিচার ও শাসন-ব্যবস্থার ভার। এইভাবে রাজার সমস্ত ক্ষমতাই সামন্তশ্রেণী দখল করেছিল।

ফিউডাল প্রাসাদ ও অশ্বারোহী যোদ্ধা—মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ত-



সামন্তদের দুর্গ

শ্রেণী প্রাসাদে বাস করত। প্রাসাদগুলি নির্মাণ করা হ'ত সাধারণতঃ পাহাড়ের চূড়ায় অথবা নদীর তীরে। যাতে শত্রুরা সহজে প্রাসাদ আক্রমণ

ন্যা করতে পারে তার জন্যে প্রাসাদের চারদিকে ছিল মোটা প্রাচীর। প্রাচীরের চারপাশে গভীর পরিখা। পরিখার উপরে সেতু পেরিয়ে প্রত্যেককে প্রাসাদে ঢুকতে হ'ত। প্রয়োজন মিটে গেলে পরিখার উপর থেকে সেতু তুলে নেওয়া হ'ত। তখন কারো পক্ষেই বাইরে থেকে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন দুর্গে প্রবেশ করা কঠিন হ'ত। প্রাসাদের মধ্যস্থলে একটি সু-উচ্চ মিনার মাথা তুলে থাকত। তার উপরে একটি ঘরে বসে প্রহরী চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখত। জমিদারদের এই প্রাসাদগুলি ছিল একেকটি দুর্গ। প্রথমে প্রাসাদগুলির নির্মাণ কাজে কাঠ ব্যবহৃত হ'ত। পরে অবশ্য কাঠের পরিবর্তে পাথর ব্যবহার করে দুর্গকে আরও দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়।

কোন শত্রুকে প্রাসাদ দখল করতে হলে পরিখা অতিক্রম করে প্রাসাদের প্রধান ফটক ভাঙতে হবে। কিন্তু একাজ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। প্রাসাদের প্রহরীরা শত্রুকে লক্ষ্য করে পাথর, কাঠ ছুঁড়ে মারত। প্রাচীরের উপর থেকে আক্রমণকারীদের মাথায় গরম তেল বা গরম জল ঢেলে দেওয়া হ'ত। এ ছাড়া প্রাচীরের ফুটো দিয়ে শত্রুদের লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করা হ'ত। মোটের উপর বাইরে থেকে আক্রমণ করে দুর্গ দখল করা প্রায় অসাধ্য কাজ ছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে এই দুর্গগুলির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার দিনে শ্লাভ, ম্যাগিয়ার প্রভৃতি হানাদারেরা প্রায়ই বিভিন্ন অঞ্চল হঠাৎ আক্রমণ করে বসত। সাধারণ মানুষ প্রাণ বাঁচাতে জমিদারদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করত। দুর্ভেদ্য দুর্গ ধ্বংস করার ক্ষমতা এই সব হানাদারদের ছিল না। সুতরাং দুর্গগুলি থাকায় সাধারণ মানুষ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল।

দুর্গ ছাড়াও মধ্যযুগের ইউরোপে শান্তিস্থাপনে সামন্তদের লৌহ বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্যদলেরও যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। এইসব যোদ্ধাদের বলা হ'ত নাইট। দীর্ঘ তরবারি ও বর্শা ছিল তাদের অস্ত্র। বর্বর হানাদারেরা দ্রুত আক্রমণের জন্য অশ্ব ব্যবহার করত। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে বর্মসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

**সামন্ততান্ত্রিক যুগের জীবনযাত্রা**—সামন্ততান্ত্রিক যুগে মানুষের জীবন ছিল খুব বেশীমাত্রায় একঘেয়ে। তাতে অবকাশ মিলত খুবই কম। অধিকাংশ সময়ই জমিদারকে দিবারাত্রি অনুচরবর্গ ঘিরে থাকত। এমনকি খাওয়ার সময়ও জমিদার একা খেতে বসত না। খাওয়ার টেবিলে তার সঙ্গে খেতে বসত অতিথি ও অনুচরবর্গ।

তারা প্রচুর পরিমাণে মদ্য ও মাংস খেত। খাওয়ার সময় পরস্পর রসিকতা করার রীতি ছিল। অনেক সময়ে প্রাসাদে ভাঁড় ও চারণকবির দল আমোদ-প্রমোদের খোরাক জোগাতো।

শিকার করা ছিল তখনকার দিনে আমোদ-প্রমোদের একটি অন্যতম অঙ্গ। মধ্যযুগের ইউরোপে বন-জঙ্গলের অভাব ছিল না। সেই বনে নানা রকমের পাখী, ভালুক, শূকর প্রভৃতি বন্যজন্তু বাস করত। অভিজাত শ্রেণী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কখনও শিকারী বাজপাখী, কখনও বা শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ত।

অভিজাতগণ শৌর্য পরীক্ষার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করত। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক সময় এই শক্তিমত্তার প্রতিযোগিতা হ'ত। প্রতিযোগিতা দেখবার জন্যে অনেক দর্শক ভীড় করত। অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে দুই অশ্বারোহী প্রতিযোগী পরস্পরের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেত। দুইজনই চেষ্টা করত আঘাত করে একে অপরকে ঘোড়া থেকে নামাতে। এর ফলে অবশ্য অনেকক্ষেত্রে প্রতিযোগীরা আহত হত, এমনকি মৃত্যুমুখেও পতিত হ'ত। প্রতিযোগীতায় বিজয়ী ব্যক্তি বিজিতের ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র পুরস্কার হিসেবে লাভ করত।



মধ্যযুগের নাইট

**শিভালরি সংগঠন**—শিভালরি সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক ধরনের সামরিক সংগঠন। মূলতঃ শিভালরি কথাটি এসেছে লাতিন শব্দ **'ক্যাবেলাস্'** থেকে; যার অর্থ **'ঘোড়া'**।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে জমিদারশ্রেণী ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যেত। এদের বলা হ'ত নাইট। নাইট সম্প্রদায় ছিল 'শিভালরি' নামক সংগঠনের সদস্য। সম্ভ্রান্তবংশের লোকরাই 'নাইট' হ'তে পারত। তা বলে সম্ভ্রান্তবংশের সব লোকই নাইট ছিল না। নাইট হতে গেলে বাল্যাবস্থা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত। কোন জমিদার হয়তো তার ছেলেকে সাত বছর বয়সে তার বন্ধু কোন জমিদারের প্রাসাদে সামাজিক আচার-ব্যবহার, নম্রতা প্রভৃতি শেখার জন্য পাঠাল। এরকম শিক্ষার্থীকে বলা হ'ত 'পেজ'। চৌদ্দ বছর বয়সে এই শিক্ষা শেষ করলে এদের বলা হ'ত 'এস্কোয়ার'। তারপর আরম্ভ হ'ত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা। অশ্বচালনা, অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান আয়ত্ত করতে হ'ত। প্রভুর প্রতি আনুগত্যবোধ, নারীজাতির প্রতি সম্মান দেখানও ছিল শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। অনেক সময় প্রভুর সঙ্গে সেবক হিসেবে তাকে শৌর্য প্রতিযোগিতায় বা যুদ্ধে যেতে হত। এইভাবে কঠোর শিক্ষা গ্রহণ করার পর কুড়ি-একুশ বছর বয়সে একজন এস্কোয়ার নাইট হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। তারপর কোন এক শুভদিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ত। বিশপ তাকে নাইটের কর্তব্য পালন সম্পর্কে শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর তাকে তরবারি প্রদান করত। এইভাবে দীক্ষার শেষে সেই ব্যক্তি 'নাইট' খেতাব অর্জন করত।

মধ্যযুগের ইতিহাসে নাইটদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিজের এলাকায় নাইট ছিল আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক ও বিচারক। চোর-ডাকাতের হাত থেকে সে বিপন্নকে উদ্ধার করত। গরীব, অসহায়, নিরীহ পথচারী প্রভৃতিকে রক্ষা করা ছিল তার কাজ। মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো তার অন্যতম কর্তব্য ছিল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সময় নাস্তিক এবং বিধর্মীদের হাত থেকে ধর্ম ও চার্চকে রক্ষা করা ছিল তার কাজের একটি অঙ্গ।

সামরিক সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠলেও শিভালরি ক্রমশঃ একটি সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়। তখন 'শিভালরি' শব্দের দ্বারা বোঝাত —বীরত্ব, বিনয়, সততা, সৌজন্যবোধ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। এইসব সদ্‌গুণগুলি

পালনের চেষ্টা করায় মধ্যযুগের দুর্দান্ত নাইট সম্প্রদায় ক্রমে সভ্য হয়ে ওঠে। সমাজে নাইট একজন আদর্শ পুরুষরূপে সকলের কাছে বিবেচিত হয়।

ত্রুবাদুর—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রোভেঁন্স অঞ্চলে স্থানীয় ভাষায় গীতিধর্মী কবিতা রচিত হয়। এই ধরনের কবিতার রচয়িতাদের বলা হয় ত্রুবাদুর ; আর কবিতাগুলিকে বলা হয় 'ত্রুবাদুর কবিতা'। অভিজাত সমাজের প্রেম-প্রীতি, বীরত্বব্যঞ্জক বা উচ্চ আদর্শের কোন কাহিনী ছিল ত্রুবাদুর কবিতার বিষয়বস্তু। প্রোভেঁন্স অঞ্চলে এইরকম প্রায় পাঁচশত ত্রুবাদুর কবির নাম জানা যায়। তাঁরা বিভিন্ন ছন্দে প্রায় ন'শ ছোট-ছোট কবিতার স্তবক রচনা করেছিলেন। ফ্রান্সে ত্রুবাদুর কবিতার জন্ম হলেও ইংলণ্ড, ইতালি, জার্মানী ও স্পেনেও এই ধরনের কবিতা প্রসারলাভ করেছিল। ইংলণ্ডের রাজা আর্থার, মহান দস্যু রবিন হুড এবং শার্লেমানের পার্শ্বচর বীর রোঁলা-এর কাহিনী অবলম্বন করে চারণ কবির দল গীত রচনা করতেন। তাদের গান সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করত। ত্রুবাদুর কবিগণ দেশীয় ভাষায় লিখতেন। তখনকার চার্চ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লাতিন ভাষা চালু ছিল। কিন্তু ত্রুবাদুরদের লেখার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেশীয় ভাষার গোড়াপত্তন হয়।

## ।। ম্যানরিয়াল প্রথা ।।

ম্যানরিয়াল প্রথা—সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি—সামন্ততান্ত্রিক যুগে অধিকাংশ লোক থাকত গ্রামে। গ্রামগুলিকে বলা হ'ত ম্যানর। প্রতিটি ম্যানরের কোন প্রভু বা জমিদার ছিল। জমিদার এই ম্যানর থেকেই তার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় শস্যাদি যোগাড় করত। সুতরাং ম্যানর হল 'জমিদারের জমিদারী বিশেষ' এবং সেই জমিদারীতে বাস করত তার প্রজাবৃন্দ। জমিদার ও তার প্রজাবৃন্দের ভরণপোষণের জন্য প্রতিটি ম্যানরকে দুইভাগে ভাগ করা হ'ত। একভাগ থাকত জমিদারের জন্য সংরক্ষিত, অপর ভাগ প্রজাদের দখলে। জমিদার তার জন্য সংরক্ষিত জমির সম্পূর্ণ ফসল নিজের ঘরে তুলত। এই জমিদারী জমিদার লাভ করত তার উর্ধ্বতন জমিদারকে সেবার বিনিময়ে। প্রতিটি ম্যানর ছিল স্বয়ং-

সম্পূর্ণ। তার অর্থ যে, একজন মানুষের বেঁচে থাকতে হলে যে সব জিনিসের প্রয়োজন হয় সবই ম্যানরের লোকেরা উৎপন্ন করত। এর জন্য তাদের অন্য কোন গ্রামে যেতে হত না। সেই সময় নগদ টাকা-কড়ির বিশেষ প্রচলন ছিল না। জিনিস দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকে তাদের প্রয়োজন মেটাত। কামার লোহার খন্তা, কুড়াল দিয়ে মুচীর কাছ থেকে জুতো নিয়ে আসত। আবার মুচীর গম দরকার হলে চাষীর কাছ থেকে জুতোর বদলে গম নিত। এইভাবে ম্যানরগুলিতে গড়ে উঠেছিল সরল আর্থিক কাঠামো।

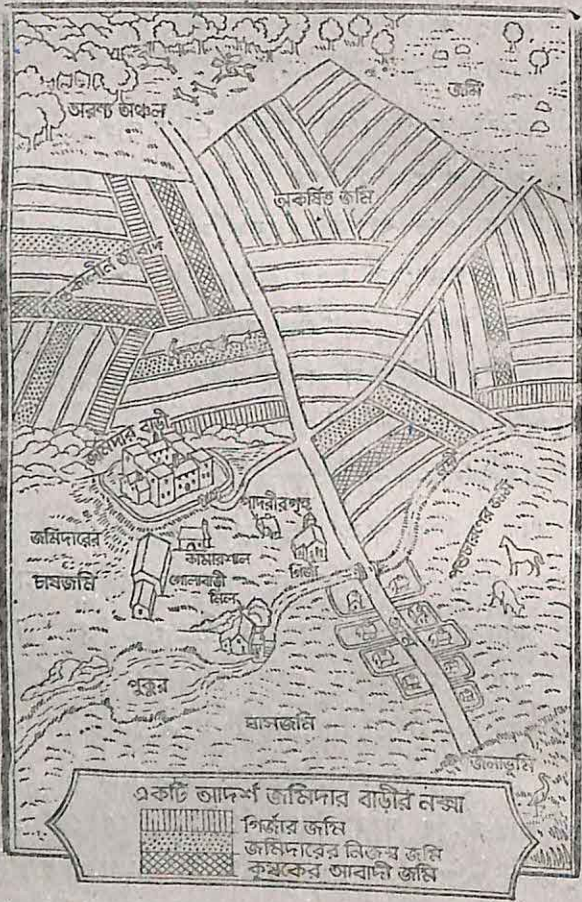
ম্যানর—সামন্ততান্ত্রিক যুগের শাসনের প্রথম ধাপ—রাজতন্ত্রের শক্তি হ্রাস পাওয়ায় সাধারণ প্রজার সঙ্গে রাজার কোন সম্পর্কই ছিল না। অপরদিকে ম্যানরের প্রভু বা জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের ছিল প্রত্যক্ষ সংযোগ। অতএব প্রজাদের সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা ছিল ম্যানরের প্রভুর দায়িত্ব। ম্যানরের মধ্যস্থলে ছিল জমিদারের সুবিশাল বাসগৃহ বা প্রাসাদ। এইখানে বসেই তিনি প্রজাদের শাসন করতেন। এককথায়, জমিদার ছিলেন তাঁর ম্যানরের শাসক ও বিচারক।

ম্যানরের বিচারালয়—প্রতিটি ম্যানরেই একটি করে বিচারালয় ছিল। ম্যানরের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিচারালয়ে হাজির হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। গ্রামের চার্চে বা জমিদারের কাছারি বাড়ীতে অথবা বাইরে গাছের ছায়ায় কোন প্রশস্ত স্থানে বিচার অনুষ্ঠিত হ'ত। প্রজাদের নিজেদের মধ্যে বা জমিদারের সঙ্গে প্রজার কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তার মীমাংসা হ'ত এই ম্যানরের বিচারালয়ে। প্রতিটি ম্যানরেরই নিজস্ব কতকগুলি রীতি প্রচলিত ছিল। প্রজারা সেই রীতি অনুসারে জমি ভোগ করত। অনেক সময়ই জমি-জমার দখল নিয়ে বিরোধ বেধে যেত; তখন সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হ'ত ম্যানরের বিচারালয়ে। ম্যানরের নিয়মকানুন কোন প্রজা লঙ্ঘন করেছে কি-না ম্যানরের প্রজারাই তা বিবেচনা করত। বিচারের কাজ সাধারণতঃ পরিচালনা করত জমিদার অথবা জমিদারের নিযুক্ত কোন কর্মচারী। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রজারাও বিচারকের আসনে বসত। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে অপরাধীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে

জরিমানা দিতে হত। জরিমানার অর্থ পেত ম্যানরের প্রভু বা জমিদার। সুতরাং জরিমানা আদায় করে জমিদারের প্রচুর আর্থিক লাভ হত।

॥ অর্থ নৈতিক অবস্থা ॥

শস্য উৎপাদনে গ্রামীন কৃষক—মধ্য যুগের ইউরোপে কলকারখানা বা ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু ছিল না বললেই চলে। তাই কৃষি উৎপাদন ছিল



একটি আদর্শ জমিদার বাড়ীর নক্সা

গ্রামের লোকের প্রধান জীবিকা। সামন্ততান্ত্রিক যুগে প্রতিটি ম্যানরের কর্ষণযোগ্য জমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হ'ত। এক ভাগে শীত-কালীন ফসল চাষ করা হ'ত; অন্য ভাগে বসন্তকালে গম, সর্ষে, যব প্রভৃতি শস্য উৎপাদন করা হ'ত; আর এক ভাগ জমিতে চাষ-

আবাদ বছর খানেক করা হ'ত না। ঘাস জন্মালে গ্রামের গরু, ভেড়া এখানে চরত। প্রতিবছরই জমির এইরকম ভাগ পাল্টে নেওয়া হ'ত। এর ফলে প্রতি তিন বছরে একবার প্রতিটি ভাগই বিশ্রাম পেত অর্থাৎ সেখানে চাষ-আবাদ করা হ'ত না। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যই এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। আবাদী জমির প্রতিটি ভাগকেই আবার আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি কয়েকটি ফালিতে ভাগ করা হ'ত। নীচু আল দিয়ে এক ফালিকে অন্য ফালি থেকে পৃথক করা হ'ত। ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি জমির ফালি সংরক্ষিত থাকত জমিদারের নিজের জন্য। ম্যানরের চাষীরাও আবাদযোগ্য জমির তিনটি ভাগেই দু-এক ফালি করে জমি পেত। তার ফলে এক জায়গায় এক সঙ্গে অনেকটা করে জমি কেউ পেত না। প্রত্যেকেই ম্যানরের বিভিন্ন স্থানে জমির টুকরো লাভ করত। এইভাবে সবাই পেত ভাল-মন্দ মিশিয়ে জমি। এক-এক টুকরো জমির পরিমাণ ছিল প্রায় এক একর। ঐ পরিমাণ জমি সাধারণতঃ একদিনে চাষ করা যেত। কোন্ চাষী কত টুকরো আবাদী জমি পাবে তা নির্ভর করত তার ক্ষমতার উপর। অন্ততঃ দু'টি হালের বলদ যে চাষীর আছে তার ভাগ্যে জুটত ত্রিশ একর জমি অর্থাৎ ত্রিশ টুকরো জমি। প্রত্যেক চাষীই যার যার নিজের জমির টুকরোর ফসল ঘরে তুললেও জমিতে খাটত সকলে একসঙ্গে। তখনকার দিনে জমি চাষ করতে হলে চারটি অথবা আটটি হাল ও বলদের দরকার হ'ত। কিন্তু অধিকাংশ চাষীরই দু'টির বেশী হাল ও বলদ ছিল না। তাই জমি চাষ করতে একে অপরকে সাহায্য করত। প্রত্যেকের জমিতে বীজ বপন করা, হাল করা ও ফসল কাটা—সব ব্যাপারেই সবাই হাত লাগাত। আর সকলেই যেহেতু ভাল-মন্দ পাঁচমিশালী জমির অধিকারী, তাই প্রত্যেকেই পেত প্রায় একই পরিমাণের ফসল। সাধারণ চাষীদের বলা হত সার্ফ বা ভিলেইন।

চাষীদের প্রচণ্ড শ্রম ও প্রচুর কর প্রদান—ফসল উৎপাদন করতে চাষীদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হ'ত। চাষের যন্ত্রপাতি মোটেই উন্নত ধরনের ছিল না। পিতৃ-পিতামহের আমলের সেকেলে যন্ত্রপাতি তারা ব্যবহার করত। অনেক চাষীর আবার হাল-বলদ কিছু ছিল না। জমির উপর

গাছের ডাল টেনে তারা মাটির ঢেলা ভাঙত আর ফসল ঝাড়াই করত লাঠির সাহায্যে। জমিতে তাদের সারাদিন খাটতে হ'ত। এত পরিশ্রম করেও পরিশ্রমের তুলনায় কিছুই ফসল পেত না। প্রতিটি ম্যানরেই বেশ কিছু পরিমাণে জমি থাকত জমিদারের খাস দখলে। নিজের জমির ক্ষতি করেও জমিদারের জমি আগে চাষ করা ছিল কৃষকের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এই জন্য কৃষক কোন মজুরী পেত না। জমিদারের জমি চাষ করতে গিয়ে কৃষক অনেক সময় নিজের জমি ভালভাবে চাষ করার সময় পেত না। এই বেগার খেটেই কৃষকের রেহাই ছিল না। নিজে সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিতে যে ফসল ফলাতো তার একটা মোটা অংশ কর বাবদ জমিদারকে দিতে হ'ত। এছাড়াও প্রয়োজনে তারা জমিদাকে বিনামূল্যে জোগাত মুরগীর মাংস, নিজের মৌচাক থেকে মধু, মোম ইত্যাদি।

চাষীদের জীবনযাত্রা—মধ্যযুগে সার্ফদের জীবন মোটেই সুখকর ছিল না। তারা পাশাপাশি ঘর তৈরী করে বাস করত। ঘরগুলির দেওয়াল ছিল কাঠের। আর তার উপর পাতা চাপিয়ে তৈরী হ'ত ছাদ। ঘরে কোন চিম্‌নির বন্দোবস্ত ছিল না। তাই প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের মধ্যে চুল্লী ধরালে ধোঁয়ায় নিশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হ'ত। দেওয়ালের গায়ের ফুটো দিয়ে অতি অল্প আলোই ঘরে আসত। শীতের দিনে হাঁস-মুরগীকেও ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিতে হ'ত। ঘরের মেঝে ছিল স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার ও নোংরা।

কয়েকটি টেবিল আর বেঞ্চি ছাড়া ঘরে অন্য কোন আসবাবপত্র ছিল না। তাদের পরনে ছিল বাড়ীতে প্রস্তুত মোটা সুতার পোশাক। পায়ের জুতো ছিল ভারী কাঠের তৈরী। পরিবারের সকলে মাটির উপর খড় বিছিয়ে শুত। যবের দানা ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। এক কথায় বলা যায় যে, সার্কের জীবন ছিল পশুর জীবন।

জমিদার ও চার্চকে চাষীদের প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের কর—সার্ফরা জমিদার ও চার্চকে কত রকমের যে কর দিত তার কোন সীমা ছিল না। জমিদারের কথা না শুনলেই চাষীর উপর জরিমানা বা কর চাপানো হ'ত। যদি কেউ জমিদারের কথা না শুনে তার ম্যানরের বাইরে বিয়ে করত, তার

জন্য তাকে কর গুণতে হ'ত। এমন কি জমিদার মনোনীত পাত্র বা পাত্রীকে বিয়ে না করলেও কর দিতে হ'ত। জমিদারের বিনা অনুমতিতে কোন সার্ফ তার ছেলেকে ব্যবসা-বাণিজ্য শেখার জন্য শহরে পাঠাতে পারত না; কিন্তু জমিদারকে এর জন্য কর দিলে তার সম্মতি মিলত।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের রীতি অনুসারে ইচ্ছা করলেই জমিদার চাষীদের উপর কর বসাতে পারত। তবে স্থানীয় আইন-কানুন অনেক ক্ষেত্রেই দেয় করের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিত। প্রত্যেক সার্ফই ফি বছর জমিদারকে মাথা-পিছু কর দিতে বাধ্য থাকত। এই প্রকার কর ছিল তাদের দাসত্বের প্রতীক। তার জন্য সার্ফরা এই মাথা-পিছু কর দেওয়া খুবই অপছন্দ করত। কোন সার্ফ কষ্ট করে কিছু সঞ্চয় করলে তার উপরেও কর ধার্য করা হ'ত। এই প্রকার করকে বলা হ'ত টেইলি। খ্রীষ্টের জন্মদিনে বা ইষ্টার উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা হ'লে চাষীরা জমিদারকে নানাপ্রকার জিনিস দিতে বাধ্য থাকত। কোন সার্ফের মৃত্যুর পর যখন তার ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে চাষ করার জন্য জমি পেত তখন জমিদারকে সে হেরিয়ট নামে একপ্রকার কর দিত। এসব ক্ষেত্রে সার্ফদের কাছ থেকে ভালো কোন আসবাবপত্র বা ভালো জাতের গবাদি পশু ছিল জমিদারের প্রাপ্য।

প্রতিটি ম্যানরেই ছিল শস্য পেশাইয়ের কল, ময়দার রুটি করার চুল্লী, আঙ্গুরের মদ তৈরীর কারখানা, দিশী মদের ভাটি। এইগুলি ছিল জমিদারের নিজস্ব একচেটিয়া সম্পত্তি। ম্যানরের প্রতিটি সার্ফের পক্ষে এইগুলি ব্যবহার করা ছিল বাধ্যতামূলক। শস্য পেশাই করতে হ'ত জমিদারের কলে। রুটি বানাবার জন্য ময়দা পাঠাতে হ'ত চুল্লীতে। মদ তৈরীর জন্য আঙ্গুর ও যব পাঠাতে হ'ত মদের কারখানায়। এইসব ব্যবহারের জন্যে সার্ফদের কাছ থেকে চড়া হারে মাশুল আদায় করা হ'ত। গ্রামের রাস্তা ও সেতু ব্যবহার করলে এবং গ্রামের কূপের থেকে জল তুললে জমিদারকে শুল্ক দিতে হ'ত। যদি ম্যানরের মধ্যে কোন বাজার থাকত তবে বিক্রেতারা জমিদারকে কর দিত। বছরের কোন নির্দিষ্ট সময় মদ বিক্রয় করা ছিল জমিদারের একচেটিয়া অধিকার। মদ পান করুক আর নাই করুক, চাষী জমিদারের কাছ থেকে মদ কিনতে বাধ্য ছিল।

চার্চও সার্ফদের শোষণ করতে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে ছিল না। চাষী তার উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ চার্চকে দিত। এই প্রকার করকে বলা হত টাইথ। এছাড়াও যে পরিমাণে তার পালিত গবাদি পশুর সংখ্যা বাড়বে তারও এক-দশমাংশ ছিল চার্চের প্রাপ্য। সমস্ত মিটিয়ে দিলেও চার্চ দাবী করত যে চার্চের সমুদয় প্রাপ্য দেওয়া হয়নি। সেইজন্য চাষীর মৃত্যুকালেও চার্চকে কর হিসেবে তার ভালো কোন আসবাবপত্র বা ভালো কোন গৃহ-পালিত পশু দিতে হ'ত। এককথায় বলা যায় জমিদার ও চার্চের প্রাপ্য মেটাতে গিয়ে সার্ফদের প্রায় সর্বস্বান্ত হ'তে হ'ত।

ম্যানরস্থিত জমিদার বাড়ীর জীবনযাত্রা—ম্যানরের সবচেয়ে ভাল জায়গায় জমিদারের বাসগৃহ নির্মিত হ'ত। জমিদার অথবা তার কর্মচারীবৃন্দ এখানে বাস করত। চাষীদের ঘিঞ্জি কুঁড়েঘরের তুলনায় জমিদারের বাসগৃহ ছিল অনেক জমকালো এবং সুরক্ষিত। জমিদারের প্রাসাদগুলি ছিল ত্রিতলবিশিষ্ট। একতলা ছিল মাটির নীচে—এখানে রাখা হ'ত বিরাট বিরাট পাত্র এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। মাটির উপরে দোতলায় ছিল জমিদারের শয়নকক্ষ, বৈঠকখানা, ভাঁড়ার ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার আলমারী। জমিদারের শয়নকক্ষের অনতিদূরে থাকত শৌচাগার এবং চাকরদের ঘর। প্রাসাদের দু'টি তলাতেই রান্নাঘর ছিল। নীচের তলার রান্নাঘরে পশু-পাখী হত্যা করে রান্না করা হ'ত; আর উপর তলার রান্নাঘরে অন্যান্য জিনিস রান্না করা হ'ত। জমিদারের ছেলেরা শয়ন করত একটি বিরাট হলঘরে; তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত সুখের।

তিনটি শ্রেণী—যাজক, জমিদার ও সার্ফ—মধ্যযুগের ইউরোপে প্রতিটি ম্যানরেই তিন শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎ মিলত; যথা—(১) যাজক, (২) জমিদার ও (৩) সার্ফ। সার্ফরা পরিশ্রম করে ফসল ফলাত। আর অবশিষ্ট দুই শ্রেণী তাদের করত শোষণ। শোষণ বজায় রাখার জন্য যাজকরা প্রচার করত যে এই শ্রেণী-বৈষম্য ঈশ্বর-সৃষ্ট। শিক্ষা পেলে শোষণের জন্য যদি সার্ফদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, সেইজন্য তাদের অজ্ঞ ও মূর্খ করে রাখা হ'ত।

জমিদার ও সার্ফ—বিপরীত শ্রেণীভুক্ত—জমিদার ও সার্ফ বাস করত একই ম্যানরে। তাদের ধর্মও ছিল এক। রাজনৈতিক কারণে ও

অর্থনৈতিক দিক থেকে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর মধ্যে ছিল পর্বত-প্রমাণ ব্যবধান। অভিজাতগণ সার্ফদের অস্পৃশ্য বলে মনে করত। চার্চও মুখে শ্রেণী-সাম্য প্রচার করলেও বাস্তবে কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্য রাখার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করত। অভিজাতগণ ও যাজকরা ছিল সুখী শ্রেণী, আর অপরদিকে সার্ফদের অবস্থা ছিল দুর্বিসহ।

সার্ফ—জমিদারের সম্পত্তি স্বরূপ—সার্ফদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব ছিল না। গরু-ভেড়ার মত তারা ছিল জমিদারের সম্পত্তি। যদি এক জমিদারের কাছ থেকে অন্য জমিদারের কাছে কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হ'ত তবে সে সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল সার্ফরাও থাকত তার অধীনে। সার্ফরা তাদের চাষের জমি ছেড়ে অন্য কোন জীবিকা গ্রহণ করতে পারত না অথবা ইচ্ছা করলে অন্য কোন জমিদারের জমি চাষ করতে পারত না। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দামই ছিল না—প্রভুর ইচ্ছাই ছিল তাদের ইচ্ছা।

এসব ছাড়াও সার্ফ বিনা মজুরীতে জমিদারের যাবতীয় কাজ করত। জমিদারের ঘরবাড়ী মেরামত করা, রাস্তা সংস্কার করা, পুকুর পরিষ্কার করা বা জমিদারের জন্য পুকুর থেকে মাছ ধরা—সবই সার্ফকে করতে হ'ত। চাষীর স্ত্রী ও মেয়েরা জমিদার বাড়ীর জন্য পোশাক বুনত। তাদের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বন থেকে জমিদারের খাওয়ার জন্য ফল কুড়িয়ে আনত। চাষী-যাতে কিছুমাত্র বিশ্রাম করতে না পারে সেদিকে জমিদারের কর্মচারীদের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। জমিদারের জন্য এইরূপ বাধ্যতামূলক শ্রমদানকে বলা হ'ত কোর্ভা বা ক্যরভেই। শুধু ইউরোপে নয় ভারতবর্ষেও এই ধরনের রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল।

বংশানুক্রমিক ভূমি-দাসত্ব—কোন জমিদারের অধীনে সার্ফের জীবন কেউ বরণ করলে এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ছিল। কোন সার্ফের মৃত্যু হলে তার পুত্র পিতার স্থান দখল করত। তার কাছে জীবিকা অর্জনের অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। কোন সার্ফের পক্ষে তার ছেলেকে অন্য কোন জীবিকা গ্রহণের জন্য শহরে পাঠাবার উপায় ছিল না—কারণ এসব ব্যাপারে জমিদারের সম্মতি পাওয়া যেত না। ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ জমিদারকে জরিমানা দিলে অবশ্য সম্মতি পাওয়া যেত কিন্তু অনেক

সময়ই জরিমানার অর্থ দেওয়া সার্কের ক্ষমতার বাইরে থাকত। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাদের সার্কের জীবন বরণ করে নিতে হ'ত।

মুক্তির উপায়—এই দুর্বিসহ জীবনযাত্রা সার্ফদের পক্ষে ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠল। বিভিন্ন উপায়ে তারা এই জীবন থেকে রেহাই পেতে চাইল।

সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ—অনেকে জমিদারের সম্মতি নিয়ে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী দলে নাম লেখাত। কিন্তু সবসময় জমিদার যে সম্মতি দেবে তার কোন মানে নেই। জমিদার সম্মতি না দিলে ম্যানর ছেড়ে সার্ফদের পালানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ধর্মযুদ্ধে যোগদান—একাদশ শতকে ইউরোপে ধর্মযুদ্ধ (ক্রুশেড) আরম্ভ হয়েছিল। এই যুদ্ধে বহু সৈন্য দরকার। বহু ভূমিদাস জমিদারের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ধর্মযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে নাম লেখাত।

শহরে পলায়ন—একাদশ-দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের অনেক স্থানেই শহরের উদ্ভব হয়েছিল। শহরে নানান শ্রেণীর লোকের বাস; সুতরাং গ্রাম থেকে শহরে পালিয়ে আসতে পারলে জমিদারের পক্ষে সার্ফদের ধরা সম্ভবপর ছিল না। তাই অনেক সার্ফই এই সহজ পন্থা বেছে নিয়েছিল।

ব্যবসায় বৃত্তি ও শিল্প উৎপাদন—শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানান শিল্প-দ্রব্যেরও চাহিদার সৃষ্টি হ'ল। অতএব সার্ফদের জীবিকার জন্য আর দুশ্চিন্তা করতে হ'ল না। তাদের অনেকে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করল, আবার অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে রত হ'ল।

সার্ফদের-বিদ্রোহ—যেসব সার্ফ পলায়ন করল না তাদের মধ্যে অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশেষে এই অসন্তোষ একদিন বিদ্রোহে রূপান্তরিত হ'ল। সেই সময়ে চাষ-বাস ছেড়ে তারা প্রভুর গোলা-বাড়ীতে, কলে, আগুন লাগত। এই বিদ্রোহে অনেক সময়েই নিষ্ঠুর লোভী জমিদারকে তারা মেরে ফেলত। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ইংলণ্ডে, ফ্লাণ্ডার্সে, বোহেমিয়ায় ও জার্মানীতে এরকম বহু প্রজা-বিদ্রোহ হয়েছিল। ভারতবর্ষেও সামন্তযুগে যে অনেক প্রজা-বিদ্রোহ হয়েছিল, ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

(১) সামন্ততন্ত্র কাকে বলে? (২) সামন্ততান্ত্রিক যুগে কিভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে নতুন ধরনের ভূমি-বন্দোবস্ত গড়ে উঠেছিল? (৩) সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কি ধরনের স্তরভেদ ছিল? (৪) সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমিদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর। (৫) ফিউডাল প্রাসাদের বর্ণনা দাও। (৬) নাইট কাদের বলা হত? যুদ্ধের সময় তাদের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র কিরকম ছিল? (৭) সামন্ততান্ত্রিক যুগের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। (৮) মধ্যযুগের নাইট সম্প্রদায়ের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লেখ। (৯) ম্যানোরিয়াল প্রথা কিভাবে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি রচনা করেছিল? (১০) ম্যানরের বিচারকার্য কি ভাবে অনুষ্ঠিত হত? (১১) ম্যানরের জমিচাষ পদ্ধতি আলোচনা কর। (১২) চাষীদের ঘরবাড়ী কি ধরনের ছিল? (১৩) জমিদাররা চাষীদের কিভাবে শোষণ করত? (১৪) ম্যানরস্থিত জমিদার বাড়ীর জীবন-যাত্রা বর্ণনা কর। (১৫) সার্ফরা কিভাবে জমিদারকে বাধ্যতামূলক শ্রম দান করত? (১৬) বংশানুক্রমিক ভূমি-দাসত্ব বলতে কি বোঝায়? (১৭) দুর্বিসহ জীবনযাত্রা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সার্ফদের কাছে কি কি পথ খোলা ছিল?

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দাও: (১) ইউরোপের ইতিহাসে কোন্ সময়কে সামন্ততান্ত্রিক যুগ বলা হয়? (২) রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কার ছিল? (৩) সামন্তদের প্রাসাদ কোথায় নির্মাণ করা হত? (৪) 'এসকোয়ার' কাদের বলা হত? (৫) ত্রুবাদুর কবিতা কাকে বলে? (৬) চারণ কবির দল কি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করত?

নীচের প্রশ্নগুলির ডানদিকে প্রদত্ত সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও।

১। অষ্টম শতক থেকে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় (রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে / মুসলমান ও ভাইকিংদের আক্রমণের ফলে / রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধের ফলে)।

২। নগদ মুদ্রার তেমন প্রচলন ছিল না কারণ (ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না / রাজার টাকশালে টাকা ছাপা হত না / সাধারণ লোক মুদ্রার ব্যবহারে ইচ্ছুক ছিল না)।

৩। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যত উপরের ধাপে উঠা যায় জমির মালিকের সংখ্যা ততই (বেড়ে যায় / স্থির থাকে)।

৪। প্রজাদের নিজেদের মধ্যে বা জমিদারের সঙ্গে প্রজার কোন ঝগড়া হলে তার মীমাংসা হত (রাজার বিচারালয়ে / জমিদারের বিচারালয় / ম্যানরের বিচারালয়ে)।

৫। সামন্ততান্ত্রিক যুগে প্রতিটি ম্যানরের কর্ষণযোগ্য জমিকে ভাগ করা হত (দুভাগে/ তিনভাগে / চারভাগে)।

**ভুল বাক্যগুলিকে ঠিক করে লেখ :** (১) মধ্যযুগে জমিদারেরা প্রচুর পরিমাণে ফল ও শাকসব্জী খেত। (২) নাইট হতে গেলে যুবক বয়সে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। (৩) জমিদার ও তার প্রজাবৃন্দের ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিটি ম্যানরকে চারভাগে ভাগ করতে হত। (৪) বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে অপরাধীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কারাদণ্ড দেওয়া হত। (৫) চাষীদের পায়ের জুতো ছিল চামড়ার। (৬) কোন সার্ফের মৃত্যুর পর যখন তার ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে চাষ করার জন্যে জমি পেত তখন সে জমিদারকে 'টেইলি' নামে একপ্রকার কর দিত।

---

## অষ্টম অধ্যায়
# ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

**পাঠ-সংকেত**—উদ্দেশ্য ● প্রথম ক্রুসেড ● তৃতীয় ক্রুসেড ● চতুর্থ ক্রুসেড ● ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলাফল—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল ● শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ভব ● কৃষি ও কুটির শিল্পের পৃথকীকরণ।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মভূমি জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। মহম্মদের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আরবেরা জেরুজালেম অধিকার করে নিয়েছিল। তারা খ্রীষ্টানদের উপর কোন দুর্ব্যবহার করত না। ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে সেল্‌জুক তুর্কী নামে মুসলমানদের একটি শাখা আরবদের কাছ থেকে জেরুজালেম কেড়ে নিয়েছিল। এরা কিন্তু আরবদের মত সভ্য ও পরধর্মের প্রতি সহজশীল ছিল না। তারা জেরুজালেমের খ্রীষ্টান অধিবাসীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। ইউরোপ থেকে ধর্মভীরু খ্রীষ্টানগণ এই সময়ে জেরুজালেমে তীর্থ করতে যেত। তারাও সেই সেল্‌জুক তুর্কীদের উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই পায় না। এমনকি বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের একটি অংশ তারা দখল করে নেয়। এই সময়ের বাইজেণ্টাইন সম্রাট আলেকসিয়াস কোমনেনাস ছিলেন খুবই দুর্বল প্রকৃতির লোক। মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম ও বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য তিনি পোপের কাছে

আবেদন করলেন। সেই সময়ে পোপ ছিলেন দ্বিতীয় আরবান। তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটের আবেদনে সাড়া দিলেন। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ক্লারমণ্টে তিনি এক মহাসভা ডাকলেন। এই মহাসভায় তিনি তুর্কী মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষার জন্য ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। খ্রীষ্টানরা দলে দলে এই ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। ধর্মযোদ্ধাদের পোশাকে আঁকা থাকত খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক ক্রুশ চিহ্ন। এইজন্য এই ধর্মযুদ্ধকে বলা হয় ক্রুসেড। এই ধর্মযুদ্ধ ১০৯৬ থেকে ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল।

উদ্দেশ্য—ক্রুসেডে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের সকলেরই কিন্তু উদ্দেশ্য এক ছিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের। বহু কারণে পোপ এই সময়ে ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ, সেই সময়ে জার্মান সম্রাট ও পোপের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এই নিয়ে ইউরোপে উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ চলছিল। দ্বিতীয় আরবান ধর্মযুদ্ধে যোগদানের আহ্বান দ্বারা ইউরোপবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে খ্রীষ্টান ধর্ম-জগতে পোপই সর্বপ্রধান—সম্রাট পোপের নীচে। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়া মহাদেশে খ্রীষ্টান-ধর্মযোদ্ধাগণ জয়লাভ করলে সেখানেও খ্রীষ্টানধর্ম ছড়িয়ে পড়বে। তার ফলে ঐ অঞ্চলে পোপের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়তঃ, বাইজেন্টাইনের গ্রীকচার্চ এতদিন পোপের কর্তৃত্ব মেনে চলত না। পোপ যদি বাইজেন্টাইন সম্রাটকে তুর্কীদের হাত থেকে রক্ষা করেন তবে সেখানেও তার প্রভাব বিস্তৃত হবে।

অভিজাত ভূ-স্বামীদের ক্রুসেডে যোগদানের পেছনে নানারকম উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। ধর্মের প্রতি অনুরাগ নিঃসন্দেহে তাদের উৎসাহ জুগিয়েছিল। ক্লুনির ধর্মীয় আন্দোলনে এবং বেশ কয়েকজন পোপের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণের ধর্মীয় মনোভাব উদ্দীপ্ত হয়েছিল। একাধারে প্রবল হিংসা ও নিষ্ঠুরতা, অপরদিকে সুগভীর ধর্মবিশ্বাস মধ্যযুগের অন্যতম বিশেষত্ব। মধ্যযুগের মানুষের পাপের ভয় ছিল খুব বেশী। সেইজন্য পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে বহু ক্লেশ সহ্য করে সুদূর জেরুজালেম পর্যন্ত তীর্থ পরিদর্শন করতে যেত। ধর্মযুদ্ধে যোগদান

একদিক থেকে মহাতীর্থ যাত্রা। এ ছাড়া সামন্ততান্ত্রিক যুগের ধ্যান-ধারণাও ধর্মযুদ্ধে যোগদানের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। উর্ধ্বতন প্রভুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সামন্ততান্ত্রিক যুগের অন্যতম বিশেষত্ব। সেইযুগে একজন সামন্ত তার প্রভুর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রভুর প্রতি আনুগত্য দেখাত। যারা জেরুজালেম দখল করে যীশু খ্রীষ্টের সমাধিস্থল অপবিত্র করেছে তারা ঈশ্বরের শত্রু। সুতরাং ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের অর্থ—ঈশ্বরকে সেবা করা। পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সুতরাং পোপের যুদ্ধে যোগদানের আদেশ পালন করলে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা হবে। সুতরাং পুণ্য অর্জনের প্রলোভনে ধর্মযুদ্ধে তারা দলে-দলে যোগদান করেছিল।

অন্যান্য আরও কতকগুলি কারণে অভিজাতগণ ক্রুসেডে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক যুগে ইউরোপের জনসংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু সেই তুলনায় জমির পরিমাণ বাড়েনি। তার ফলে অনেক নাইটের তেমন জমি-জমা ছিল না। তাছাড়া ইউরোপীয় আইনে একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতার মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'ত। তার ফলে পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানদের পিতার সম্পত্তি পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। তারা প্রাচ্য দেশের ধনদৌলত সম্পর্কে অনেক গুজব শুনেছিল। এশিয়া মহাদেশের রাজ্যখণ্ড জয় করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে অনেকেই ইচ্ছুক হয়েছিল; আবার অনেকে ভেবেছিল এসব সমৃদ্ধশালী অঞ্চল লুণ্ঠন করে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে আসবে। এই জাতীয় চিন্তাধারা সামন্তদের অনেককেই ক্রুসেডে যোগদানে উৎসাহিত করেছিল।

ইতালির অন্তর্গত ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি নগরীর বণিকগণ জাহাজ বোঝাই রসদ পাঠিয়ে এবং যোদ্ধাদের জাহাজে বহন করে ধর্মযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের অংশগ্রহণের পিছনে কোন ধর্মীয় অনুরাগ ছিল না। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য নিকট প্রাচ্য অঞ্চলে খ্রীষ্টান শাসকদের অধীনে বাণিজ্য-বন্দর স্থাপন করা ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

॥ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডের ইতিহাস ॥

প্রথম ক্রুসেড—১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূ-স্বামীদের নেতৃত্বে ধর্মযোদ্ধার দল এশিয়া-মাইনর অভিমুখে যাত্রা করে। তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুর্কীদের কাছ থেকে নিকায়া, এনটিয়োক্ ও অবশেষ জেরুজালেম জয় করেছিল। গড্‌ফ্রে নামক একজন ভূ-স্বামীকে জেরুজালেমের শাসকরূপে সৈন্যরা প্রথমে নিয়োগ করেছিল। গড্‌ফ্রের মৃত্যুর পর তার ভাই বড়ুলুইন ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে জেরুজালেমের রাজা রূপে ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে প্রথম ধর্মযুদ্ধ শেষ হয়।

তৃতীয় ক্রুসেড—প্রথম ধর্মযুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন যোগ্য নেতা না থাকায় দু-বছরের মধ্যেই তারা তুর্কীদের হাতে শোচনীয়ভাবে হেরে যান। এরপর ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সালাদিন আবার জেরুজালেম জয় করে নিলেন। এই সংবাদ ইউরোপে পৌছান মাত্র ইউরোপের খ্রীষ্টানদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। আরম্ভ হয় ধর্মযুদ্ধ। জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টান ধর্মজগতের তিনজন নৃপতি ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করলেন। এঁরা হলেন—জার্মানীর ফ্রেডারিক্ বার্বারোসা, ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংলণ্ডের রিচার্ড। কিন্তু পথেই জলে ডুবে মারা গেলেন বার্বারোসা। ফিলিপ অগাস্টাস ও রিচার্ডের মধ্যে মোটেই হৃদ্যতা ছিল না। প্যালেস্টাইনের উপকূলস্থিত একর নামে একটি শহর জয়ের পরে রিচার্ডকে রেখে ফিলিপ অগাস্টাস একাই প্রত্যাবর্তন করলেন। রিচার্ড যুদ্ধে সালাদিনকে পরাজিত করতে না পেরে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। চুক্তির সর্তানুসারে প্যালেষ্টাইন উপকূলে একর থেকে এস্‌কালোন পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের অধিকারে থাকবে এবং তীর্থযাত্রীদের জেরুজালেম পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে। রিচার্ড খুব সাহসী ও বীর ছিলেন। সেইজন্য তাঁকে 'সিংহ হৃদয়' বলা হ'ত।

চতুর্থ ক্রুসেড—ত্রয়োদশ শতকে পোপ তৃতীয় ইন্নোসেণ্টের আহ্বানে পুনরায় নাইটগণ ধর্মযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসে সমবেত হয়েছিল। যাতায়াতের খরচও তাদের কাছে ছিল না। ভেনিসীয়

বণিকগণ ধর্মযোদ্ধাদের বিনা খরচায় প্যালেষ্টাইনে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। ব্যবসায়ীদের সব সময় চিন্তা কি করে বেশী লাভ হয়। এ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তীরে ছিল জারা নগরী। এই নগরীর লোকেরা ভেনিসীয়দের সঙ্গে বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। তাই ভেনিসের বণিকেরা ধর্ম-যোদ্ধাদের দিয়ে জারা নগরী ধ্বংস করাল। জারার অধিবাসীরা ছিল খ্রীষ্টান। তবুও স্বার্থের খাতিরে ধর্মযোদ্ধারা একটি খ্রীষ্টান নগরী ধ্বংস করতে পিছপা হল না। এরপর ভেনিসীয়দের চাপে ধর্মযোদ্ধারা কনষ্টান্টিনোপল্ আক্রমণ করল। সুন্দর শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। শুধু তাই নয়, 'বল্ডুইন অফ্ ফ্লাণ্ডার্স' নামে একজন নাইটের উপর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করা হ'ল। ভেনিস পেল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ এবং উপকূলস্থিত এক বিশাল অঞ্চলের আধিপত্য। এইভাবে চতুর্থ ধর্ম-যুদ্ধের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটল।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলাফল—ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত পুণ্যভূমি জেরুজালেম তারা দখল করতে পারেনি। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতি মোটেই বৃদ্ধি পায়নি বরং ধর্মযুদ্ধের ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আরও অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পোপের আশা ছিল খ্রীষ্টান জগতে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপন; কিন্তু সে আশাও সফল হয়নি।

পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে ক্রুসেডের অবদান নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ রয়েছে। একশ্রেণীর ঐতিহাসিকদের মতে ক্রুসেডের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী; অপর একদল ঐতিহাসিক মনে করেন যে ক্রুসেড না হলেও একাদশ শতকের পর থেকে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন কেউ রোধ করতে পারত না। কিন্তু ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপের দৃশ্যপটের যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।*

সামাজিক ফল—ক্রুসেডে যোগদানের জন্য জমিদারগণের অর্থের

*Thompson and Jhonson—Madieval Europe

প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থসংগ্রহের জন্য তারা সার্ফ এবং শহরের অধিবাসীদের উপর তাদের বিশেষ অধিকার বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। তার ফলে গ্রামের ও শহরের অনেক মানুষ অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী সার্ফরা জমিদারের উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। শহরে অনেক শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। অনেক সার্ফ এই সুযোগে ম্যানর থেকে পালিয়ে শহরে গিয়ে রুজি-রোজগারের বন্দোবস্ত করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এইভাবে ক্রুসেডের ফলে সামন্ততান্ত্রিক অনড় সামাজিক ব্যবস্থায় অনেক ভাঙন দেখা দেয়।

ক্রুসেডে বহু ভূ-স্বামী যোগদান করেছিল। স্বদেশে তাদের দীর্ঘদিন অনুপস্থিতিকালে তাদের স্ত্রী'রা সম্পত্তি দেখাশোনা করতে আরম্ভ করে। প্রমাণিত হয় যে নারীগণও যে কোন গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম। তার ফলে ইউরোপীয় সমাজে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।

এছাড়াও প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তার ফলে ইউরোপীয়দের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালীতে এসেছিল যথেষ্ট পরিবর্তন। প্রাচ্যের সংস্পর্শে এসে এই প্রথম নানা ধরনের মসলাপাতি, মসলিন, চিনি, চাল, ভুট্টা, লবঙ্গ, দারুচিনি, তিসি প্রভৃতি ফসলের সঙ্গে ইউরোপবাসীর পরিচয় ঘটল।

সাংস্কৃতিক ফল—ক্রুসেড থেকে দেশে ফেরার সময় ধর্মযোদ্ধাগণ আরব দেশের বহু গল্প ও উপন্যাসের সংগ্রহ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এইসব গল্প ও উপন্যাস পাশ্চাত্যের কবিদের রোমান্টিক কাব্য রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যারা ক্রুসেডে যোগদান করেছিল তাদের অনেকেই লিখেছিল তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এবং দিনপঞ্জী। এইসব রচনা ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে প্রচুর উৎসাহ সৃষ্টি করে। গির্জা নির্মাণ-স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও ক্রুসেডের অবদান লক্ষ্য করা যায়। 'পবিত্র সমাধি' জেরুজালেমের যে চার্চে রক্ষিত আছে তার অনুকরণে লণ্ডনে গোলাকৃতি টেম্পল চার্চ নির্মিত হয়েছিল।

**শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ভব**—ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ ক্রুসেডের

পরে ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয় বণিকদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হয়। এতদিন পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলের বণিকেরা প্রাচ্যের থেকে জিনিসপত্র কিনে পাশ্চাত্যের বণিকদের কাছে বিক্রি করত। কিন্তু চতুর্থ ক্রুসেডের পরে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হওয়ায় পাশ্চাত্যের বণিকদের সঙ্গে প্রাচ্যের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হ'ল। এ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তীরে অবস্থিত ভেনিস, ভূমধ্যসাগরের তীরে জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি স্থানের বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ প্রথম থেকেই গ্রহণ করল। জীবিকার সন্ধানে এসব স্থানে লোকজন এসে ভীড় করল। এর ফলে ক্রমশঃ এই বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি শহরে পরিণত হ'ল। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু ইতালির নগরীগুলিতে সীমাবদ্ধ রইল না; আলপ্‌স পর্বত পেরিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীতেও ছড়িয়ে পড়ল। তার ফলে সেখানেও শহরের উৎপত্তি হ'ল। উত্তর সাগরের তীরে ফ্লাণ্ডার্স অঞ্চলেও ব্যবসা-বাণিজ্য জমজমাট হয়ে উঠল। ক্রুসেডে যোগদানকারী ধর্মযোদ্ধাদের বহনের জন্য ও তাদের খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের জন্য বড় বড় জাহাজ তৈরী হয়েছিল। এইসব বড় জাহাজ বাণিজ্যের পক্ষে অনেক বেশী সহায়ক হয়েছিল।

**কৃষি ও কুটিরশিল্পের পৃথকীকরণ (একাদশ ও দ্বাদশ শতক)**— সামন্ততান্ত্রিক যুগে যারা জমি চাষ করত তারাই বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করত। কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শতকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হ'ল। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে শহরের উদ্ভব হ'ল। ও শহরের সঙ্গে সব জায়গারই যোগাযোগের বন্দোবস্ত আছে। তাই বিভিন্ন স্থানের লোকের চাহিদা মেটাতে শহরে নানা ধরনের কুটির-শিল্পের পত্তন হ'ল। যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ভীড় করল তাদের কেউ হল কুমোর, কেউ ছুতোর, কেউ তাঁতী। চাষবাসের সঙ্গে আর তাদের কোন সম্পর্ক রইল না। এইভাবে কৃষি ও কুটির-শিল্প উৎপাদন আর একই লোকের পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না; অর্থাৎ কৃষি ও কুটিরশিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ দেখা দিল।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক্রুসেড কাকে বলে? ২। পোপ ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন কেন? ৩। অভিজাত ভূ-স্বামীদের ক্রুসেডে যোগদানের কারণ কি? ৪। ইতালির বণিকেরা কেন ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল? ৫। চতুর্থ ক্রুসেডের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত কর। ৬। ক্রুসেডের সামাজিক ফল কি? ৭। ক্রুসেডের ফলে কি করে শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল? ৮। কৃষি ও কুটিরশিল্পের পৃথকীকরণ কি ভাবে হ'ল?

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দাও: (১) যীশুখ্রীষ্টের জন্মভূমির নাম কি? (২) প্রথম ধর্ম-যুদ্ধের আহ্বান কে করেছিলেন? কেন ধর্মযুদ্ধকে ক্রুসেড বলা হয়? (৩) কে নিজেকে 'জেরুজালেমের রাজা' রূপে ঘোষণা করেছিলেন? (৪) কোন্ পোপের চেষ্টায় চতুর্থ ক্রুসেড হয়েছিল? (৫) ফিলিপ আগাষ্টাস কোন স্থানের রাজা ছিলেন? (৬) জেনোয়া কোন্ সাগরের তীরে অবস্থিত? (৭) কোন্ রাজাকে 'সিংহ হৃদয়' বলা হত। (৮) 'পবিত্র সমাধি' জেরুজালেমের যে চার্চে রক্ষিত আছে লণ্ডনে তার অনুকরণে কোন্ চার্চ নির্মিত হয়েছিল?

**ডানদিকে কতকগুলি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও:**

১। সেলজুক তুর্কী নামে মধ্য এশিয়ার তুর্কী জাতির একটি শাখা আরবদের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করে নিল (১২০৫ খ্রীঃ / ১০৭১ খ্রীঃ / ১০০০খ্রীঃ।

২। দ্বিতীয় আরবান ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যাজক ও ভূস্বামীদের এক অধিবেশন আহ্বান করেন (ক্লারমণ্টে / রোমে / ভিয়েনাতে)।

৩। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে জেরুজালেম জয় করে নিয়েছিলেন (মহম্মদ / ওসমান / সালাদিন)।

৪। ভেনিসীয়দের চাপে ধর্মযোদ্ধাগণ ধ্বংস করে ভেনিসের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী এ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলস্থিত (মিলাননগরী / জারা নগরী / লম্বার্ডি নগরী)।

৫। ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয় বণিকদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হয় (প্রথম ক্রুসেডের পরে / তৃতীয় ক্রুসেডের পরে / চতুর্থ ক্রুসেডের পরে)।

৬। ক্রুসেড থেকে ফেরার পথে জলে ডুবে মারা গিয়েছিলেন (রিচার্ড / ফিলিপ আগাষ্টাস / বার্বারোসা)।

**ভুল বাক্যগুলিকে ঠিক করে লেখ:** (১) ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নৃপতিদের নেতৃত্বে ধর্মযোদ্ধার দল এশিয়া মাইনর অভিমুখে যাত্রা করে। (২) প্যালেষ্টাইনের উপকূলস্থিত

এন্‌টিয়োক শহর নামে একটি শহর জয়ের পরে রিচার্ডকে রেখে ফিলিপ অগাষ্টাস একাই প্রত্যাবর্তন করলেন। (৩) ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেড হয়েছিল। (৪) ক্রুসেডের ফলে ইউরোপীয় সমাজে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস পেল। (৫) ক্রসেড থেকে দেশে ফেরার সময় ধর্মযোদ্ধাগণ আরব দেশের বহু পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিল।

---

নবম অধ্যায়

# নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ

**পাঠ-সংকেত**—শহরের উদ্ভব ● ক্রুসেডের অবদান ● শহরে গিল্ড বা সমবায় সঙ্ঘের উৎপত্তি ● সমবায় সঙ্ঘের কাজ।

প্রাচীন রোমান সম্রাটদের আমলে ইউরোপে কতকগুলি শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বর্বর জাতিগুলির আক্রমণের ফলে এই শহরগুলি ধ্বংস হয়। পথঘাট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কোন যোগাযোগ থাকে না। এই অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ। ম্যানরের অধিবাসীরা যে সব জিনিস উৎপন্ন করত তা দিয়ে কোনরকমে নিজেদের প্রয়োজন মিটত। কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্তন হল। সর্বত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হল। তখন নতুন করে আবার শহর গড়ে উঠল।

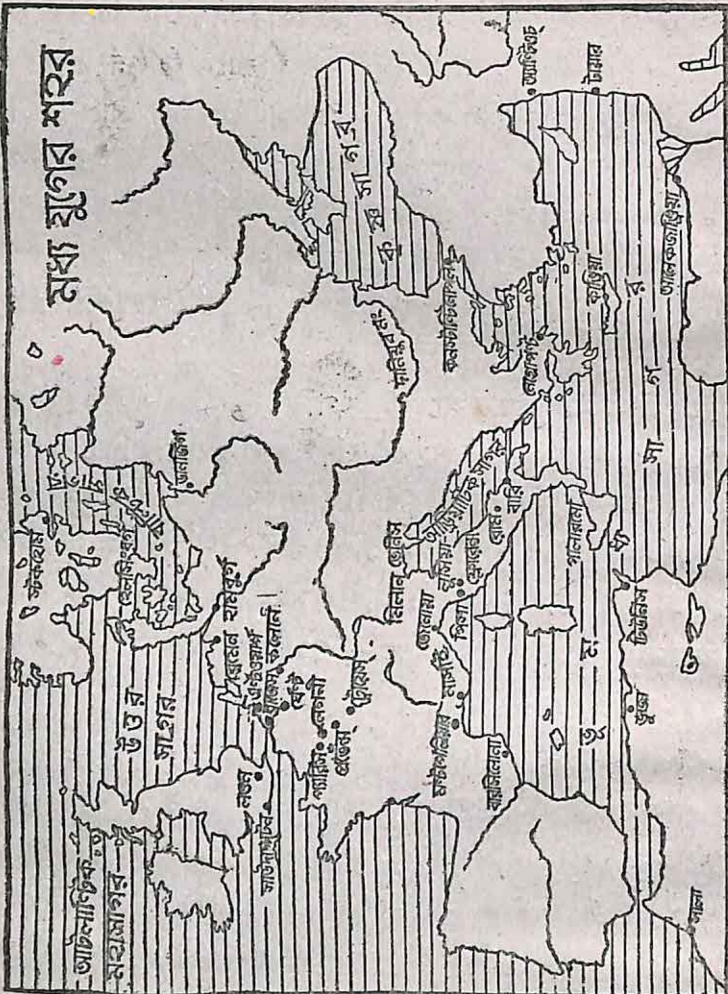
**ক্রুসেডের অবদান**—একাদশ শতাব্দী থেকে আবার ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ হ'ল। ক্রুসেড ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন দুয়ার খুলে দিল। ইউরোপে প্রাচ্যের শিল্পদ্রব্যের প্রচণ্ড চাহিদা সৃষ্টি হ'ল। সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ইতালির নগরীগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের এই সুযোগ গ্রহণ করল পুরোমাত্রায়। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ও ঈজিয়ান সাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি নগরীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে আসে। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপকূলভাগে তারা তাদের নিজস্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু ইতালিতেই আবদ্ধ রইল না, সমগ্র ইউরোপেই

ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। যেসব স্থানের সঙ্গে জলপথে বা স্থলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে উঠল। এসব স্থানে জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এসে ভীড় করল। ধীরে ধীরে এসব স্থানে বিভিন্ন শিল্পের পত্তন হ'ল। এইভাবে গড়ে উঠল শহর। ভেনিস, জেনোয়া, বোলোনা, পিসা, ভেরোনা, ফ্লোরেন্স, মিলান এবং নেপল্স ছিল ইতালির গুরুত্বপূর্ণ নগরী। ফ্রান্সের অন্যতম নগরী রূপে প্যারিস, লিঁও, মার্সাই, অরলিয়েন্স, বুলোন প্রভৃতি খ্যাতি লাভ করে। উত্তরে ফ্লাণ্ডাস অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। লণ্ডনও ইংলণ্ডের প্রধান শহররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

**শহরে গিল্ড বা সমবায় সঙ্ঘের উৎপত্তি**—একাদশ শতকের শেষে বা দ্বাদশ শতকের প্রথমে প্রতিটি শহরেই বণিক ও কারিগরদের গিল্ড বা সমবায় সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল। সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকলে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় আবার ব্যবসায়েরও নানারকম সুবিধা হয়—এই জাতীয় চিন্তাধারাই সমবায় সঙ্ঘ গড়ে ওঠার কারণ। প্রথমদিকে সমবায় সঙ্ঘের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক ছিল না। স্বেচ্ছায় এর সদস্যপদ গ্রহণ করা চলত। প্রথমে অবশ্য বণিকদের সমবায় সঙ্ঘ সৃষ্টি হয়। শহরের প্রতিটি বণিককেই এর সদস্য হতে হত। কারিগরগণও প্রথমদিকে এই সঙ্ঘের সদস্য ছিল। ধীরে ধীরে শিল্পের বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরদের সংখ্যাও বেড়ে গেল এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হতে লাগল। তার ফলে প্রথমদিকের পুরানো বণিক সমবায় সঙ্ঘ থেকে কারিগরদের সঙ্ঘ পৃথক হয়ে গেল। ক্রমে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের আলাদা আলাদা সমবায় সঙ্ঘ গঠিত হল। এইভাবে কামার, কুমোর, তাঁতী, মুচি, ছুতোর প্রভৃতি—প্রত্যেকেরই পৃথক সমবায় সঙ্ঘ গড়ে উঠল।

**সমবায় সঙ্ঘের কাজ**—সমবায় সঙ্ঘ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনেকগুলি ; যথা—(১) শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের উপর সঙ্ঘের সদস্যদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা ; (২) সমবায় সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা বজায় রাখা ; (৩) একই ধরনের উৎকৃষ্ট

মানের শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা ও (৪) কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা।




প্রতি শহরেই জিনিস-পত্র বেচা-কেনার উপর নানারকমের শুল্ক ও কর ধার্য করা হ'ত। এতে সমবায় সঙ্ঘের পক্ষে বেচা-কেনার উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপনের সুবিধা হয়েছিল। সমবায় সঙ্ঘের সদস্যদের শহরের মধ্যে ব্যবসা করতে হলে কোন শুল্ক বা কর দিতে হ'ত না। কিন্তু যারা সমবায় সঙ্ঘের সদস্য নয় অথবা যারা বাইরের ব্যবসাদার তাদের শুল্ক ও কর দিতে

হ'ত। একমাত্র সমবায় সঙ্ঘের সদস্যদের কাছেই তারা তাদের পণ্য বিক্রয় করতে পারত। আবার বাইরের বণিকদের কোন কোন জিনিস ক্রয় করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারিগরী সমবায় সঙ্ঘের ছিল আরও কঠোর নিয়ম। এরূপ সঙ্ঘের সদস্য না হলে কাউকেই কোন শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করার অনুমতি দেওয়া হ'ত না। সব শহরে অবশ্য একই ধরনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বিভিন্ন শহরে এই সম্পর্কে ছিল বিভিন্ন ধরনের নিয়ম।

সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যাতে বিরাট পার্থক্য না থাকে সেদিকে সমবায় সঙ্ঘগুলির সজাগ দৃষ্টি ছিল। এর জন্য সঙ্ঘগুলি সদস্যদের প্রতি অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল। যদি কোন বণিক বাজার থেকে সব শিল্পদ্রব্য একা কিনে নেয় তবে সে চড়া দামে তা বিক্রী করে প্রচুর লাভ করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে অন্য ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এরকম যাতে না হয় সেই জন্য সমবায় সঙ্ঘ আইন করেছিল যে একা কোন বণিক সব পণ্যদ্রব্য কিনতে পারবে না। সঙ্ঘভুক্ত সব সদস্যকেই কম-বেশী জিনিস কিনতে দিতে হবে। এমনকি কোন কারিগর যদি কোন উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করে একাই তার লাভ ভোগ করতে চাইত তবে সমবায় সঙ্ঘ তাকে তা করতে দিত না। সবাই মিলে সুযোগ সমানভাবে না পেলে কেউ হবে অতিরিক্ত ধনী আর কেউ হবে অতিরিক্ত গরীব। সব কারিগরের পক্ষে শিল্প উৎপাদনের জন্য সম সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা ছিল বাধ্যতামূলক। আর শ্রমিকদের বেতন দিতে হত একই হারে। সকল কারিগরের উৎপাদনের পরিমাণ যাতে মোটামুটি একই রকম হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা। উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-মূল্য বেঁধে দেওয়া হ'ত। কেউ কম দামে জিনিস বিক্রয় করেছে প্রমাণিত হলে তাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হ'ত। জিনিসের মান যাতে ঠিক থাকে সেদিকে গিল্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত। ঠিকমত জিনিসের মান বজায় থাকছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য গিল্ডের নিজস্ব পরিদর্শকের দল ঘুরে বেড়াত। এক কারিগর অন্য কারিগরের কর্মচারীকে বেশী মাইনে দিয়ে নিতে পারত না কারণ তা হলে সমবায় সঙ্ঘের হাতে তাকে শাস্তি পেতে হ'ত।

দক্ষ কারিগর হওয়া খুব সহজ ছিল না। যে কোন শিক্ষার্থীকে বেশ

কয়েক বছর হাতে-কলমে কাজ শিখতে হ'ত। সমবায় সঙ্ঘ শিক্ষার্থীদের দক্ষতার পরীক্ষা নিত। এই পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হলে তাকে মাষ্টার বা কর্তা কারিগর বলে স্বীকার করে নেওয়া হ'ত।

সমবায় সঙ্ঘগুলিকে কিছু কিছু সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হ'ত। সমবায় সঙ্ঘের কোন সদস্য পীড়িত হলে বা কোন কারণে তার আর্থিক অনটন দেখা দিলে সঙ্ঘের তহবিল থেকে তার পরিবারকে সাহায্য করা হ'ত; অথবা কোন সদস্যের মৃত্যু হলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় ব্যয় বহন করত এই সমবায় সঙ্ঘ। এমনকি প্রয়োজন দেখা দিলে মৃতের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও সঙ্ঘ গ্রহণ করত। এই সমবায় সঙ্ঘকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল শহরের সামাজিক জীবন।

শহরের জীবনযাত্রা—মধ্যযুগের শহরগুলি ছিল সাধারণতঃ চারদিকে খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত। কতকগুলি শহর আবার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। হাতে টানা সেতু দিয়ে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হ'ত। প্রতি শহরেই সপ্তাহে দু-তিন দিন হাট বসত। সেই হাটে গ্রামের মানুষ নিয়ে আসত নানারকম ফসল ও তরি-তরকারী। শহরের মানুষ তাদের কাছ থেকে ভোগ্যপণ্যের বিনিময়ে ঐ সব জিনিস কিনত। গ্রামের তুলনায় শহরগুলি ছিল অনেক বেশী কর্মচঞ্চল। শহরের লোকেরা কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য, কেউ বা শিল্প উৎপাদনে সব সময় ব্যস্ত থাকত। তবে আধুনিক শহরের সঙ্গে মধ্যযুগের শহরের কোন তুলনাই চলে না। শহরের প্রধান রাস্তা বাদ দিলে বাকী সব রাস্তাই ছিল অপ্রশস্ত। শহরের প্রধান সড়ক সাধারণতঃ বাঁধানো হ'ত; কিন্তু আর বাকী রাস্তাগুলি হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে যেত। শহরে শান্তি শৃঙ্খলা বিশেষ ছিল না। সন্ধ্যার পরে কেউ সাধারণতঃ চোর-ডাকাতের ভয়ে পথে বের হ'ত না। রাত্রিতে কারো কোন কারণে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে সঙ্গে দু-চার জন লোক নিয়ে বেরুতে হ'ত। তবে শহরের লোকের জীবন একেবারে আমোদ-প্রমোদহীন ছিল না। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হ'ত। খোলা জায়গায় ধর্মীয় অলৌকিক নাটক দেখান হ'ত। শহরের লোক তাতে যোগদান করত।

**রাজকীয় সনদ ও শহরের স্বায়ত্বশাসন**—ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে উঠল শহর। শহর যে জমিদারের এলাকায় গড়ে উঠত সে জমিদারের কর্তৃত্ব তারা স্বীকার করে নিত। বিপদে জমিদারের কাছে তারা আশ্রয় চাইত। এই আশ্রয় দানের পরিবর্তে সামন্ততান্ত্রিক যুগের সব আইন-কানুন শহরবাসীদেরও মেনে চলতে হ'ত। জমিদারের প্রয়োজনে তাদের অনেক সময় পরিশ্রম করতে হ'ত। এর ফলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্প উৎপাদনের হ'ত প্রচণ্ড ক্ষতি। ক্রমশঃ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং শহরের আয়তন গেল বেড়ে। শহরের অধিবাসীরা বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করার সামর্থ্য অর্জন করল। প্রতি পদক্ষেপে জমিদারের উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তখন তারা নিজেদের স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থার জন্য দাবী জানাল।

রাজা বা জমিদাররা ভেবে দেখল শহরবাসীদের ক্ষমতালাভের আন্দোলন বন্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব বিবাদ না করে শান্তিপূর্ণ পথে এই প্রশ্নের মীমাংসা হলে বরং তাদের লাভই হবে। সেইজন্য বহুক্ষেত্রেই রাজা বা বড় জমিদার অর্থের বিনিময়ে শহরগুলিকে স্বায়ত্ব-শাসনের সনদ প্রদান করল। অর্থাৎ শহরগুলি নগদ টাকায় স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার ক্রয় করে নিল। তবে সব শহরই শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বায়ত্ব-শাসন লাভ করেনি। ফ্রান্সের কয়েকটি শহরকে জমিদাররা স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার দান করতে কিছুতেই রাজী ছিল না। তখন শহরগুলি তাদের দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হল। শহরের প্রশাসনিক সংগঠনকে বলা হ'ল কমিউন; এবং শেষ পর্যন্ত কমিউনগুলি যুদ্ধ করে তাদের স্বায়ত্ব-শাসনের সনদ আদায় করেছিল।

**বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব**—আগেই বলা হয়েছে যে মধ্যযুগে পথ-ঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব বেশী। জমিদার ও বিশপ শ্রেণী যে সব প্রাচীর-ঘেরা সুরক্ষিত স্থানে বাস করত তাকে বলা হ'ত 'বুর্গ'। শহর গড়ে ওঠার প্রথম যুগে ব্যবসায়ী ও কারিগর সম্প্রদায় প্রাচীরের বাইরে বসতি স্থাপন করেছিল। এইসব বসতিগুলি ফরাসী ভাষায় 'ফ-বুর্গ' নামে পরিচিত ছিল। ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেশী সংখ্যক লোক এসে এই 'ফ-বুর্গ' গুলিতে ভীড় করল।

এই সব ফ-বুর্গের বাসিন্দারা পেশায় বণিক ও কারিগর। জীবিকার জন্য এরা নিজেরা খাটে আবার অপরকেও খাটায়। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে এদের সচেতনতা তীব্র। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এরা বিত্তবান। শহর উদ্ভবের আগে সমাজে দু'টি শ্রেণী ছিল—জমিদার ও সার্ফ। জমির সঙ্গে এই দু'টি শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু 'ফ-বুর্গে'র ব্যবসায়ী ও কারিগর সম্প্রদায়ের জমির সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং জমিদার ও সার্ফ ভিন্ন ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায় তৃতীয় এক শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল। 'ফ-বুর্গে'র এই বাসিন্দাদের বলা হ'ত বার্জেস বা বার্ঘার। ক্রমশঃ এই সম্প্রদায় থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

(১) নগরীর উৎপত্তিতে ক্রুসেডের অবদান কি? (২) গিল্ড বা সমবায় সঙ্ঘ কেন গড়ে উঠেছিল? (৩) সমবায় সঙ্ঘ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? (৪) সমবায় সঙ্ঘ সদস্যদের অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করার জন্য কি কি পন্থা গ্রহণ করেছিল? (৫) সমবায় সঙ্ঘের নির্দেশে কারিগরী শিক্ষা কিভাবে দেওয়া হত? (৬) সমবায় সঙ্ঘ কিভাবে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করত? (৭) শহরের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর। (৮) শহরগুলি কিভাবে স্বায়ত্ব-শাসন আদায় করেছিল? (৯) বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা কর।

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

**এককথায় উত্তর দাও:** (১) কখন প্রতিটি শহরে বণিক ও কারিগরদের সমবায় সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল? (২) সমবায় সঙ্ঘের তহবিল থেকে কখন সদস্যের পরিবারকে সাহায্য করা হত? (৩) শহরের লোকেরা কি কাজ করত? (৪) 'বুর্গ' কাকে বলে? (৫) বার্ঘার কাদের বলা হয়?

শূন্যস্থান পূরণ কর:

(১)—ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন দুয়ার খুলে দিল। (২)—ও ইংলণ্ডের প্রধান শহররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। (৩) প্রথমে অবশ্য—সবায় সঙ্ঘ সৃষ্ট হয়। (৪) শহরের প্রশাসনিক সংগঠনকে বলা হয়—।

ডানদিকে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে; সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও:

১। ইতালির বণিকেরা তাদের নিজস্ব বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করল
(চীনে / ভারতবর্ষে / সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের উপকূলভাগে)।

২। জমিদাররা স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার দান করতে কিছুতেই রাজী হল না। (জার্মানীর কয়েকটি শহরকে / ইংলণ্ডের কয়েকটি শহরকে / ফ্রান্সের কয়েকটি শহরকে)।

৩। শহর উদ্ভবের আগে সমাজে ছিল (তিনটি শ্রেণী / দুটি শ্রেণী / চারটি শ্রেণী)।

৪। ফ-বুর্গের বাসিন্দাদের বলা হত (বার্জেস / বণিক / কারিগণ)।

ভুল বাক্যকে ঠিক করে লেখ: (১) পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ও ইজিয়ান সাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য, লণ্ডন এ্যান্টোয়ার্প, বেইমস্ প্রভৃতি নগরীর নিয়ন্ত্রণে আসে। (২) প্রথমে কারিগরদের সমবায় সঙ্ঘ সৃষ্ট হয়। (৩) শহরে সব রাস্তাই ছিল প্রশস্ত। (৪) রাজা বা বড় জমিদার স্বেচ্ছায় শহরগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দান করল। (৫) জমিদার শ্রেণী থেকে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল।

---

## দশম অধ্যায়

# সুদূর প্রাচ্যে মধ্যযুগ—চীন ও জাপান

পাঠ সংকেত—মধ্যযুগে চীন (৭ম—১৪শ শতক) ● তাং যুগ (৬১৮—৯০৭ খ্রীঃ) ● চীন পুনরায় ঐক্যবদ্ধ ● আইন-কানুনের পুনঃ সংস্কার ● শিক্ষা-ব্যবস্থা ● শিক্ষনীয় বিষয় ● সাহিত্য (কবিতা) ● চা ● মুদ্রণ শিল্প ● শিল্প ● ব্যবসা-বাণিজ্য ● কৃষি ● চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ● জাপান, আনাম ও কোরিয়ায় চীনা সভ্যতার প্রসার ● চীন একটি আদর্শ দেশ ● হিউয়েন সাং-এর ভারত ভ্রমণ ও তার ফলাফল ● সাং যুগ (৯৬০—১২৬০ খ্রীঃ) গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা—বাণিজ্যের রাষ্ট্রীকরণ ● রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষি ঋণদান ● সম্পত্তি-কর ধার্যকরণ ● বেগার প্রথা বিলোপ ● শিক্ষা ও সংস্কৃতি ● সাহিত্য ● চিত্র শিল্প ও পোর্সিলেন শিল্প ● ইউয়ান যুগ (১২৮০—১৩৬৮ খ্রীঃ) ● মোঙ্গল ● কুবলাই খাঁ ● মার্কোপোলের বিবরণ ● মধ্যযুগের প্রথম দিকে জাপানের সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ● মিকাডোর ক্ষমতা বৃদ্ধি ● চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ● সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির বাধাপ্রধান ● মিকাডো—

সিন্টোধর্মের প্রধান পুরোহিত ও স্বৈরাচারী রাজা ● সামান্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির ও বৌদ্ধমঠগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি ● শোগান ● সামুরাই ● জাপানী শিভালড়ি ( বুসিডো )।

সুদূর প্রাচ্য বলতে চীন, জাপান, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে বোঝায়। আমরা এখন চীন ও জাপান—এই দু'টি দেশের ইতিহাস সম্পর্কে বর্তমানে আলোচনা কর'ব।

॥ মধ্যযুগে চীন ( ৭ম শতক—১৪শ শতক ) ॥

চি'ন্ বংশের পতনের পর হান্ বংশের রাজারা খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬ থেকে ২২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হান নৃপতিদের সুশাসনে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। কিন্তু হান্ বংশের অবসান হলে চীনে আবার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এইভাবে চার'শ বছর ধরে চীনের বিভিন্ন অংশে চলল স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের শাসন। ফলে জনসাধারণের দুঃখের আর সীমা রইল না। দেশের এই চরম দুর্গতির দিনে পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন উত্তর চৌ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ইয়াং চিয়েন। তিনি উত্তর চৌ রাজ্যের নাবালক নৃপতিকে অপসারিত করে ৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সুই রাজবংশ কিন্তু দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে পারেনি। ইয়াংতি যখন সম্রাট তখন রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলেন।

॥ তাং যুগ ( ৬১৮—৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ ) ॥

সেনাপতি লি-ইউয়ান তাঁর পুত্র লি-সি-মিনের সাহায্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দমন করে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাং বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। লি-ইউয়ান্ ইতিহাসে কাও-সু নামে পরিচিত। কাও-সু কিছুদিন রাজত্ব করে পুত্র লি-সি-মিনের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন।

চীন পুনরায় ঐক্যবদ্ধ—লি-সি-মিন্ বা তাং-তাই-সুং ছিলেন তাং বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। পশ্চিম দিকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। পূর্ব তুর্কীরা তাঁর রাজধানী চাংআন আক্রমণ করলে তিনি তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু এতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি

কৌশলে পূর্ব তুর্কীদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে অতি সহজেই তাদের রাজ্য জয় করলেন। এর কিছুদিন পরে পশ্চিম তুর্কীরা তাঁর কাছে পরাজিত হয়। এবার গোবি মরুভূমির বাসিন্দা 'উইঘার' নামে এক তুর্কী উপজাতির সঙ্গে তাই সুং বন্ধুসূত্রে আবদ্ধ হলেন। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব মোঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার খিতান নামে এক মোঙ্গোল উপজাতি তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। তারিম উপত্যকায় কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠী বাস করত। তারাও চীন সম্রাটের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। এমন কি কাশগড়, ইয়ারকন্দ, সমরকন্দ, বোখারাও চীনা বাহিনীর পদানত হয়েছিল। তাই সুং-এর মৃত্যুকালে পশ্চিমে রুশ-তুর্কীস্তান ও দক্ষিণে আফগানিস্তান সমেত সমগ্র ভূ-খণ্ডে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল।

**আইন-কানুনের পুনঃসংস্কার**—তাং বংশের আগে বেশ কয়েক শতক ধরে চীনে চলছিল নানা বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা। প্রদেশগুলি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এইজন্য সম্রাট তাং তাই সুং শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করলেন। ভৌগোলিক প্রকৃতি অনুযায়ী সারা চীন দেশকে তাং তাই সুং দশটি তাও অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। প্রদেশগুলি পুনরায় কতকগুলি চৌ বা জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। চৌ-গুলি আবার সিয়েন বা মহকুমায় বিভক্ত হয়েছিল। চৌ-এর সংখ্যা ছিল ৩৫৮। আগেকার যুগে গুণ বিচার না করে প্রশাসনিক পদে কর্মচারী নিয়োগ করা হ'ত। তার ফলে অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের হাতে জনসাধারণের দুর্দশার সীমা ছিল না। তাং তাই সুং এই পদ্ধতির পরিবর্তন করেন। একমাত্র যারা যোগ্য তাদেরই সম্রাট নিজে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তার ফলে কেন্দ্রের অধীনে সব প্রদেশেই আবার সুশাসন প্রবর্তিত হ'ল। কর্মচারীদের কাজের প্রতি নজর রাখার জন্য আবার পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছিল। এই পরিদর্শকেরা ছিল সম্রাটের খাস কর্মচারী।

**শিক্ষা-ব্যবস্থা**—চীনে শিক্ষার সমাদর ছিল খুব বেশী। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত। প্রাথমিক শিক্ষার পরে যেসব ছাত্র আরও জ্ঞান অর্জন করতে চাইত তারা শহরে কলেজে ভর্তি হ'ত।

কলেজী শিক্ষার পরবর্তী ধাপ বিশ্ববিদ্যালয়। হান্ যুগেই চাংআন শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চীনের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র সেখানে বিদ্যাশিক্ষা করতে আসত। তাই সুং-এর সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮০০০ এবং তার মধ্যে ৩২৬০ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে বাস ক'রত।

চীনে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হ'ত তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা হ'ত। তার ফলে অভিজাতদের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল।

শিক্ষানীয় বিষয়—ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য বিষয় ছিল কন্‌ফুসিয়াসের পাঁচটি প্রাচীন সাহিত্য; যথা—'লি চি' বা অনুষ্ঠান-পঞ্জী, 'ই কিং' বা পরিবর্তন গ্রন্থ, 'সি কিং' বা কাব্য গ্রন্থ, 'চুন চিউ' বা বসন্ত ও শরতের বিবরণ এবং 'সু কিং' বা ইতিহাস গ্রন্থ। কন্‌ফুসিয়াস রচিত নীতিশাস্ত্রও ছাত্রদের পড়তে হ'ত। এসব ছাড়াও ইতিহাস, আইন, অঙ্ক, পদ্য, লিখন-শিল্প এবং তাও-তত্ত্বও শিক্ষনীয় বিষয় ছিল।

সাহিত্য (কবিতা)—তাং যুগে কাব্যের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। বহু কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই যুগে। 'তাং যুগের কাব্য সংগ্রহ' গ্রন্থে তিন হাজার কবির নাম লিখিত আছে। এইসব কবিদের মধ্যে লি-পো, তু-ফু'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লি-পো'র কবি-প্রতিভা সম্রাট মিং হুয়াং-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা প্রচুর। লি-পো'র সমগ্র রচনাবলী মোট ৩০ খণ্ডে বিভক্ত। তু-ফু'র কবিতার ছন্দ ও মাধুর্য খুবই উপভোগ্য। এই সময়ের অপর একজন বিখ্যাত কবির নাম পো-চু-ই। তাঁর রচনাতে কন্‌ফুনীয় আদর্শ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পো-চু-ই প্রায় চার হাজার কবিতা লিখেছেন। লি-পো'র সমসাময়িক কবি মেং-হো-যান্। চীনাদের কাছে মেং-হো-যানের খ্যাতি যথেষ্ট। তাং রাজাদের আমলেই এই প্রতিভাসম্পন্ন কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেইজন্যই তাং যুগকে 'কাব্যের স্বর্ণযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়।

চা—চা পানের অভ্যাস চীনে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। তারপর ক্রমশঃ

তা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 'চা' শব্দটি চীনা। চীনা কবিরা চা পানের উপরে কবিতাও লিখেছেন।

মুদ্রণ শিল্প—মুদ্রণ শিল্পের প্রথম প্রচলন হয় চীনে। তুন্ হুয়াং-এর হাজার বুদ্ধের গুহায় জগতের প্রাচীনতম ছাপা একটি বৌদ্ধ-গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছে। এই গ্রন্থের নাম 'হীরক সূত্র'। ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণকে বিতরণের জন্য কাঠের ব্লক থেকে ওয়াং চিয়ে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত করেছিলেন। চীনে কখন মুদ্রণ আরম্ভ হয় তা সঠিক জানা যায়নি। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সুই যুগ থেকে মুদ্রণের প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল। হান্ যুগে কন্‌ফুসীর গ্রন্থাবলী পাথরে খোদাই করে রাখা হয়েছিল। তারপর কাগজ প্রস্তুত হলে তুলি দিয়ে লেখা হ'ত। ক্রমশঃ কাঠের ব্লক আবিষ্কার করা হ'ল। বই ছাপা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুদ্রণের ব্যবহার শুরু হ'ল। ৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছু আগেই খেলার তাস চীন দেশে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল।

শিল্প—তাং রাজত্বের প্রথম শতকে চীনে ভাস্কর্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। তাং সম্রাটগণ মধ্য-এশিয়া ও ভারতবর্ষ থেকে বহু ভাস্কর আনিয়েছিলেন। তাঁরা নিপুণ হাতে ছেনি দিয়ে পাথর কেটে মন্দিরের দেওয়ালে বহু বৌদ্ধমূর্তি খোদাই করেছেন। সম্রাজ্ঞী উ ৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লুং-মেনের গুহা-মন্দিরে বিরাট এক বৈরোচন বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তাং যুগে মৃতশিল্পেরও অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। মৃত্যুর পরে কবরে চীনাদের মৃতদেহকে নর্তকী, ভৃত্য, প্রহরী, অভিনেতা প্রভৃতি মাটির মূর্তি দিয়ে ঘিরে রাখা হ'ত। এছাড়াও সমাধির মধ্যে থাকত ছোট ছোট বাড়ী-ঘর। মৃৎশিল্পে চীনা শিল্পীদের দক্ষতা সমাধিগুলির মধ্যস্থিত জিনিসগুলি থেকে বোঝা যায়।

চীনে শিল্পীদের মধ্যে চিত্র-শিল্পীদের মর্যাদা ছিল খুব বেশী। মর্যাদায় কবির পরেই ছিল চিত্র-শিল্পীদের স্থান। ব্যাপক মন্দির ধ্বংস হওয়ার ফলে তাং যুগের অধিকাংশ প্রাচীর-চিত্র লুপ্ত হয়েছে। তবুও আজও তুন্ হুয়াং গুহায় ও ওয়ান্-কো-সিয়া মন্দিরের প্রাচীর গাত্রের চিত্রশিল্পগুলি দেখলে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়। অনেক শিল্পী রেশমের কাপড়ের ওপরে সযত্নে ছবি এঁকেছেন। তুরফানে এই জাতীয় ছবির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ

চিত্রশিল্পী ছিলেন উ-তাও-জু। তাঁকে 'চীনের রাফায়েল' বলা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ধর্মীয় চিত্র অঙ্কনে তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। চাংআন ও লো-ইয়াং-এর মন্দির সমূহের প্রাচীর-চিত্র অঙ্কন এই শিল্পীর প্রধান কীর্তি। প্রথম তাং সম্রাটের প্রপৌত্র লি-সু-সুন ও তার বন্ধু শিল্পী ওয়াং ওয়েই 'উত্তর শিল্পায়তন' ও 'দক্ষিণ শিল্পায়তন' নামে দু'টি শিল্পধারার প্রবর্তক। আরও বহু প্রতিভাশালী শিল্পী তাঁদের অবদানের দ্বারা তাং যুগকে সমৃদ্ধ করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য—তাং রাজত্বকালে চীনের সঙ্গে বিদেশের সংযোগের পথ মুক্ত হওয়ার ফলে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। আরব ও ভারত থেকে বিদেশী বণিকেরা জলপথে চীনে এসে উপস্থিত হ'ত। আরব বণিকদের সংখ্যা ছিল খুবই বেশী। তারা ব্যবসার সুবিধের জন্য 'ক্যানটনে' একটি উপনিবেশ খুলেছিল। আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক সংগ্রহের জন্য একটি সরকারী দপ্তর খোলা হয়েছিল। চীন থেকে বিদেশে রপ্তানী হ'ত রেশমী কাপড়, মসলা ও চীনা বাসন। আর বিদেশ থেকে চীনে আমদানী হ'ত হাতীর দাঁত, ধূপ, তাম্র, গণ্ডারের শৃঙ্গ, কচ্ছপের খোল ইত্যাদি। কোরিয়া, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গেও চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

কৃষি—চীনের জনসাধারণ ছিল কৃষিজীবী। তাং যুগে সরকারী উদ্যোগে সেচের কিছু কিছু বন্দোবস্ত হয়েছিল। তার ফলে কৃষির উন্নতি হয়েছিল। কৃষকগণ জমিতে বিভিন্ন ধরনের সার ব্যবহার করত। বছরে জমিতে দু'তিন রকম ফসল ফলত। উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ভুট্টা ও চাল। গম, যবও উৎপাদিত হ'ত—তবে কম পরিমাণে। পেঁয়াজ, রসুন, নানারকম তরি-তরকারী উৎপাদনেও তারা পিছিয়ে ছিল না। প্রজাদের মধ্যে জমি যাতে সমভাবে বণ্টিত হয় সেইজন্য প্রথম তাং সম্রাট জমি পুনর্বণ্টনের পরিকল্পনা করেছিলেন।

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার—হান্ সম্রাট মিং তি ভারতবর্ষ থেকে কাশ্যপ-মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য নামে দুই বৌদ্ধ শ্রমণকে চীনে এনেছিলেন। এঁদের চেষ্টায় বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। অনুবাদকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন

কুমারজীব। চাংআন নগরে তিনি একটি বিরাট সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা চুরানব্বই। এইসব ভিক্ষুদের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের 'মহাযান রূপ' চীনের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করেছিল। চীনের থেকেও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার জন্য দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে যেত। এইসব চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎ-সিং প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

**জাপান, আনাম, ও কোরিয়ায় চীনা সভ্যতার প্রসার**—জাপান, কোরিয়া, আনাম ছিল চীনের প্রতিবেশী দেশ। হান্ যুগে সম্রাট উ কোরিয়া, দক্ষিণে আনাম, ফু কিয়েন প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেছিলেন। সুতরাং এইসব অঞ্চলে চীনদেশের সভ্যতার বিস্তার হওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা। চীনের হরফ, শিক্ষা-পদ্ধতি, চীনের শিল্পদ্রব্য ও বৌদ্ধধর্ম—প্রতিবেশী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

**চীন একটি আদর্শ দেশ**—উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে চীন সভ্যতার চরম স্তরে উন্নীত হয়েছিল। চা, মুদ্রণ, কাগজ প্রভৃতি আবিষ্কারের দ্বারা চীন পৃথিবীর সভ্যতার ধারাকে পুষ্ট করেছে।

**হিউয়েন সাং-এর ভারত ভ্রমণ ও তার ফলাফল**—৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে হিউয়েন সাং বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। তারিম উপত্যকার মধ্যদিয়ে পর্যটন করে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিনি ভারতে উপনীত হন। তিনি ভারতে ১৪ বছর অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেন। নালন্দায় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণের ফলে ভারতের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছিল। প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি বহু বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে যান। চীনে ফিরলে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হয়। তিনি বহু বৌদ্ধশাস্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের সমষ্টি, আকারে খ্রীষ্টীয় বাইবেলের পঁচিশ গুণ। এই গ্রন্থগুলি চীনে বৌদ্ধধর্মকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিল। চীনে বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে যোগাচার দর্শনের শিক্ষাদান তাঁর এক বিশেষ অবদান।

॥ সুং যুগ ( ৯৬০—১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ ) ॥

তাং বংশের পতনের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর চীনে পুনরায় চলে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। শক্তিশালী রাজতন্ত্র না থাকায় প্রদেশ পাল ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অবশেষে সেনাপতি চাও-কুয়াং-ইন্ বুদ্ধিবলে চীনের বিভক্ত খণ্ডগুলি পুনরায় একত্রিত করলেন। তিনিই সুং-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্রাট চাও-কুয়াং-ইন্ ইতিহাসে তাই-জু নামে বেশী পরিচিত।

প্রজাদের স্বার্থে নতুন আইন-কানুন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে সুং বংশ ইতিহাসে অধিক খ্যাতি লাভ করেছে।

সুং রাজবংশের অন্যতম নৃপতি ছিলেন সেন-সুং (১০৬৮—১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি কন্‌ফুসিয়াসপন্থী রক্ষণশীল মন্ত্রীদের অপসারিত করে ওয়াং আন্ সি নামে একজন প্রগতিশীল ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রী হয়েই ওয়াং-আন্-সি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি নতুন বিধি চালু করলেন।

॥ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ॥

বাণিজ্যের রাষ্ট্রীকরণ—কৃষকেরা উৎপন্ন ফসলের একাংশ রাজাকে কর হিসেবে দিত। চীনের সকল প্রদেশ থেকে ফসল গিয়ে জমা হ'ত রাজধানীতে —রাজার শস্যভাণ্ডারে। এই ফসল রাজধানীতে খুব সস্তায় বিক্রী হয়ে যেত। কিন্তু দূর অঞ্চলে যেখানে ফসলের অভাব দেখা দিত সেখানে ফসলের দাম হ'ত খুব বেশী। এই প্রথায় রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি হ'ত আর কৃষকদেরও দুর্গতির শেষ থাকত না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ওয়াং একটি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করলেন। প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব গোলা স্থাপিত হ'ল। সেই গোলায় কৃষকের কাছ থেকে কর হিসেবে পাওয়া ফসল মজুত রাখা হ'ল। প্রয়োজন অনুসারে সরকার গোলার ফসল অন্যত্র পাঠিয়ে বিক্রী করতেন। এর ফলে রাষ্ট্রেরও যেমন লাভ হ'ল অপর দিকে কৃষকদেরও ন্যায্যমূল্যে শস্য পেতে কোন অসুবিধে রইল না।

রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষি-ঋণ দান— ভারতের মত চীনের কৃষকেরাও ছিল খুবই

দরিদ্র। চাষবাস করার মত মূলধন তাদের ছিল না। সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে অতিরিক্ত চড়া সুদে জমি-জমা বন্ধক রেখে তারা অর্থ জোগাড় করত। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বেড়ে যেত। বিপুল ঋণ শোধ করার ক্ষমতাও হতভাগ্য চাষীর থাকত না। এই সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে দরিদ্র প্রজাদের রক্ষার জন্য বার্ষিক শতকরা ৩৩·৩ ভাগ সুদে রাষ্ট্রকর্তৃক কৃষকদের ঋণদানের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রদত্ত ঋণের সুদের হার ছিল মহাজনদের গৃহীত সুদের হারের চেয়ে অনেক কম।

সম্পত্তি-কর ধার্যকরণ—ওয়াং আন্-সি রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পত্তির উপর কর ধার্যের পরিকল্পনা করেন। কর সংগ্রহের সুবিধের জন্য সম্পত্তির আয়কে তিনি পাঁচটি স্তরে ভাগ করেন। আয় অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন করের হার ধার্য করা হয়েছিল। নতুন নীতি অনুসারে যার যত বেশী বিত্তের পরিমাণ তাকে তত বেশী কর দিতে হ'ত। এই আইন দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

বেগার প্রথা বিলোপ—আগেকার রীতি অনুযায়ী প্রজাদের নির্দিষ্ট কোন সময়ে রাষ্ট্রের কাজে বেগার খাটতে বাধ্য করা হ'ত। ওয়াং এই প্রথা রহিত করেন এবং রাষ্ট্রের কাজের জন্য নগদ পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত করেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি—তাং যুগের মত সুং যুগেও শিক্ষার সমাদর ছিল খুব বেশী। আগের মতই প্রাচীন শাস্ত্র, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিবিদ্যা, তাং যুগের কাব্য, সুং যুগের পাঠ্য-তালিকায় স্থান পেয়েছিল। রাজকর্মচারী নির্বাচনের জন্য পরীক্ষা-পদ্ধতি সুং যুগে আরও কঠোর করা হয়েছিল। পরীক্ষার ক্ষেত্রে যাতে কেউ বিন্দুমাত্র প্রভাব খাটাতে না পারে তার ব্যাপক বন্দোবস্ত নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষা যে খুব কঠিন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে যে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা শতকরা কুড়ি ভাগের বেশী নয়।

সুং যুগে সংস্কৃতির ধারা বিচিত্র পথে প্রবাহিত হয়।

সাহিত্য—এই সময়ে বহু দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে চেন-তুয়ান্, চৌ-তুন্-ই, সাও তিয়াং প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কন্‌ফুসিয়াসের দর্শনের নতুন ভাষ্য রচনা এই যুগের দার্শনিকদের বিরাট অবদান। সুং যুগেই জন্মেছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্যু-মা-কুয়াং। তাঁর

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম জু-চি-তুং-চিয়েন। এতে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে সুং বংশের আরম্ভ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বকোষ রচনা এ যুগের আরেকটি বিশেষত্ব। সুং রাজাদের আমলে কথা-সাহিত্য খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। একালের দু'টি গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, উদ্ভিদ বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রেও নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, গ্রন্থ ছাপার কল্যাণেই সাহিত্য রচনার বিপুল উদ্যম সম্ভব হয়েছিল।

চিত্র শিল্প ও পোর্সিলেন শিল্প—সুং চিত্রশিল্প উৎকর্ষের চরম শিখরে উঠেছিল। চেং-সু-সিয়াও ছিলেন একজন বিখ্যাত চিত্রকর। তাঁর অঙ্কিত দৃশ্যপটগুলি অত্যন্ত জীবন্ত। চীনদেশে এই সময়ে বহু শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট হুইং সুং নিজে ছিলেন শিল্পের একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি চিত্র শিক্ষাদানের জন্য একটি শিল্প মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই মহাবিদ্যালয়ের চিত্রশালায় ছিল অসংখ্য চিত্র সংগ্রহ।

সুং যুগে পোর্সিলেনের ওপর চিত্র অঙ্কনেও শিল্পীরা অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পোর্সিলেনের ওপর চক্‌চকে একরঙা পালিশ মাখানো হ'ত এবং তার ওপর আঁকা হ'ত চিত্র।

মোটকথা চিত্রলিখন থেকে শুরু করে পানাহার পর্যন্ত সকল বিষয়েই চীনাদের শিল্পী-সুলভ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ ইউয়ান যুগ ( ১২৮০—১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ) ॥

মোঙ্গোল—চীনের উত্তরে মোঙ্গোলিয়ার অধিবাসীদের বলা হ'ত মোঙ্গোল। মোঙ্গোলরা বহু জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এরকম একটি মোঙ্গোলীয় উপজাতির সর্দার তেমুচিন শৌর্য-বীর্য ও কৌশলে অন্যান্য উপজাতিগুলিকে নিজের অধীনে আনয়ন করলেন। এর ফলে মোঙ্গোলরা একটি দুর্ধর্ষ পরাক্রান্ত শক্তিরূপে পরিণত হ'ল। তেমুচিন মধ্য-এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ বা 'সার্বভৌম সম্রাটরূপে' পরিচিত হলেন।

চেঙ্গিস খাঁ'র সময় থেকেই চীনের বিরুদ্ধে মোঙ্গোলদের অভিযান

আরম্ভ হয়েছিল। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিসের মৃত্যু হয়। তাঁর পৌত্র কুবলাই খাঁ সুং রাজবংশকে নির্মূল করে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সম্রাট হন।

কুবলাই খাঁ—কুবলাই খাঁ ইউয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কুবলাই খাঁ চতুর্দিকে অভিযান চালিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি হয়েছিলেন এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। পূর্ব তুর্কীস্তান (সিন কিয়াং), দক্ষিণ সাইবেরিয়া, মধ্য-এশিয়া ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অংশ, দক্ষিণ-পশ্চিমের ইউনান প্রদেশসহ সমগ্র চীন—কুবলাই-এর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

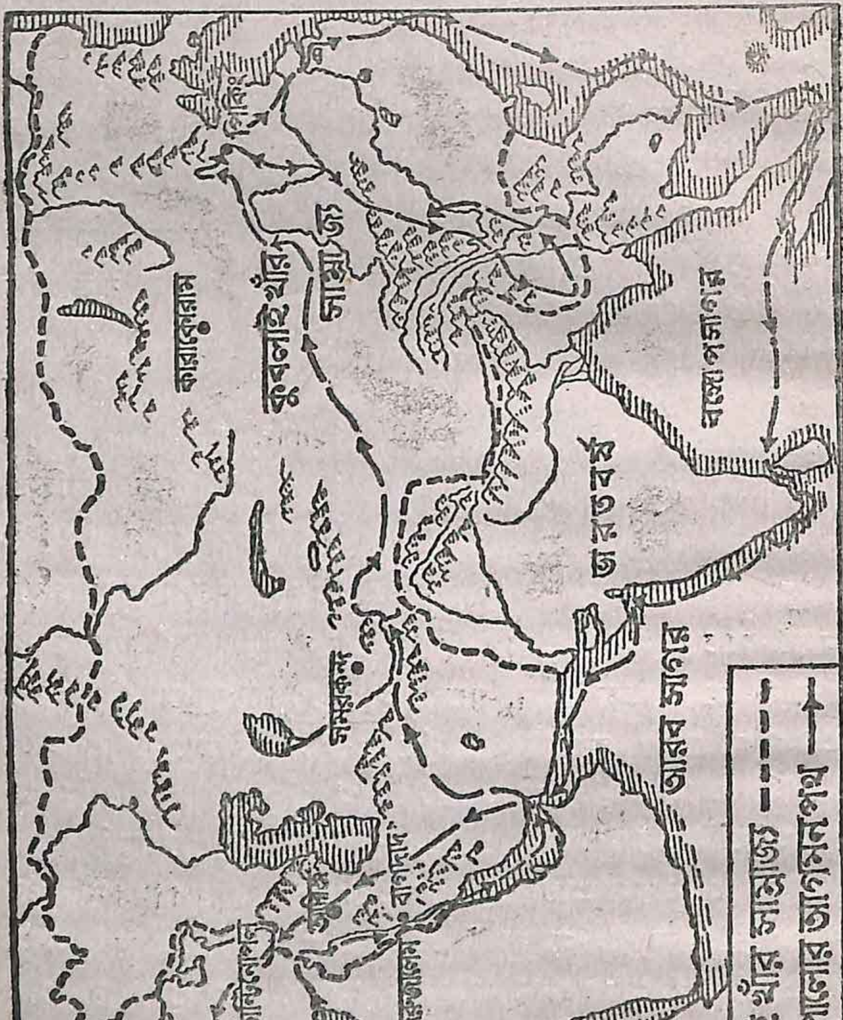


কুবলাই খাঁ

কুবলাই খাঁর রাজধানী ছিল পিকিং। এখানে প্রকাণ্ড নতুন নগর গড়ে উঠেছিল। এই নগরের অতুল ঐশ্বর্য ও প্রভূত জনসংখ্যা সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করত। মার্কোপোলোর বিবরণী থেকে কুবলাই খাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। মার্কোপোলো কুবলাই খাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন। কুবলাই খাঁর চরিত্রের দু'টি গুণ তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। দু'টি গুণের একটি পরধর্ম সহিষ্ণুতা, অপরটি বিশ্বপ্রেম অর্থাৎ বিদেশীকে সমাদর করা। কুবলাই খাঁ তিব্বতী-বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ মোঙ্গোল লিখন প্রণালী পরিবর্তন করে তিনি তিব্বতী বর্ণ-মালার ধাঁচের লিখন প্রবর্তন করেছিলেন। সকল ধর্মের প্রতিই তাঁর ছিল সমান উদার মনোভাব। বৌদ্ধ শ্রমন, নেষ্টোরীয় ও তাও পুরোহিত, মুসলমান মোল্লা সকলকেই তিনি করদান থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খাঁ'র মৃত্যু হয়।

মার্কোপোলোর বিবরণ—মার্কোপোলো ছিলেন ভেনিসের অধিবাসী। তিনি তাঁর বাবা ও কাকার সঙ্গে ভেনিস থেকে রওনা দিয়েছিলেন। পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে পারস্য ও তারিম উপত্যকার উপর দিয়ে তাঁরা

১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পৌঁছেছিলেন পিকিং-এ কুবলাই খাঁর দরবারে। কুবলাই খাঁ তাঁদের খুব সমাদর করেছিলেন। মার্কোপোলোকে তিনি রাজকার্যে নিযুক্ত




করেছিলেন। বছর পনেরোরও কিছু বেশী সময় মার্কোপোলো রাজকার্য উপলক্ষ্যে চীনের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। সেই সময়ে চীনের

সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাঁর গভীরভাবে পরিচয় ঘটেছিল। চীন থেকে ফেরার সময় তাঁরা সুমাত্রা ও দক্ষিণ ভারতেও এসেছিলেন। দেশে ফিরে মার্কোপোলো তাঁর বিদেশ পর্যটনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এইভাবে রচিত হ'ল 'মার্কোপোলোর ভ্রমণ কথা'। এই গ্রন্থ থেকেই প্রথম ইউরোপ দূর-প্রাচ্যের সমৃদ্ধির কথা জানতে পারে।


মার্কোপোলো

মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে রাজধানী পিকিং-এর একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে পিকিং শহরে প্রচুর সুরম্য অট্টালিকা আছে। তিনি সেখানকার অগণিত হোটেল, হাজার হাজার দোকান-পাট, প্রচুর খাদ্য-সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ী বোঝাই রেশম নগর-দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। সেই রেশম বুনে নগরবাসীর বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কুবলাই খাঁর প্রাসাদটি ছিল মর্মর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাসাদের জানালাগুলি কাচের; নানা বর্ণের টালির ছাদ। মার্কোপোলো স্বীকার করেছেন যে পিকিং-এর মত সমৃদ্ধ শহর তিনি কখনও দেখেননি।

## ॥ মধ্যযুগে জাপান ॥

চীনের প্রতিবেশী দেশ জাপান। চারদিকে সমুদ্র ঘিরে রেখেছে এই দেশকে। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জাপান তার স্বাতন্ত্র্য সবসময়ে বজায় রেখেছে। জাপানের আদিম অধিবাসীদের নাম আইনু। তারপরে উত্তরে কোরিয়া থেকে মোঙ্গোল উপজাতি এবং দক্ষিণদিকে মালয় ও ইন্দোনেশিয়া থেকে বিভিন্ন উপজাতি জাপানে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করেছে।

মধ্যযুগের প্রথমদিকে জাপানের সমাজ-ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি—মধ্যযুগে জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল

পরাক্রমশালী। প্রতিটি লোকের আনুগত্য ছিল তার গোষ্ঠীর প্রতি। জনসাধারণ কর দিত তাদের গোষ্ঠীর সর্দারদের। গোষ্ঠীর সর্দাররা জমিদার হয়ে বসেছিল। কৃষকদের উৎপন্ন ফসলে জমিদাররা ভাগ বসাত। যুদ্ধ বাধলে কৃষকরাই জমিদারের অধীনে যুদ্ধে যোগ দিত। রাজতন্ত্র থাকলেও রাজার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। রাজাকে গোষ্ঠী সর্দারের প্রধান বলে মনে করা হ'ত। তার সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীভুক্ত সাধারণ লোকের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কতকগুলি পরিবার নিয়ে গঠিত হ'ত এক-একটি গোষ্ঠী। পরিবারের পিতাই ছিল সর্বেসর্বা। তার কথা পরিবারের সকলকে মেনে চলতে হ'ত। ঠিক তেমনি গোষ্ঠীর সর্দারের আদেশ গোষ্ঠীভুক্ত সকল পরিবার মান্য করত। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবল রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার পক্ষে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

### ।। মিকাডোর ক্ষমতা বৃদ্ধি ।।

জাপানে রাজাদের উপাধি ছিল মিকাডো। প্রথমে জাপানে ইয়ামাতো পরিবার রাজত্ব ক'রত। এই বংশের শোতুকু তাই সি রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে চীন থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্মের ঢেউ এসে পৌঁছাল। ইয়ামাতো রাজ-পরিবার এই নতুন ধর্ম সাদরে গ্রহণ করল॥ অনেক জাপানী বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য চীনে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে তাঁরাই হলেন জাপানে চীনা-সংস্কৃতি প্রচারের প্রধান বাহন। যুবরাজ শোতুকু তাই সি চীনের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি কোরিয়া ও চীন থেকে শিল্পী ও কারিগরদের জাপানে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় জাপানে বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসার হয়। শোতুকু তাই সিকে বলা হয় জাপানী সভ্যতার জনক। ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে শোতুকু তাই সি চীনের তাং রাজদরবারে দূত প্রেরণ করেছিলেন। এইসঙ্গে চীনে গিয়েছিল বহু তরুণ ছাত্র। তারা জাপানে ফিরে এসে নানারকম সংস্কারে মন দিয়েছিল।

চীনে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার ধাঁচে জাপানেও ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করা হ'ল। এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি। এতদিন পর্যন্ত অভিজাত পরিবারেরা স্বাধীনভাবে জমি দখল করে আসছিল। নতুন সংবিধানে ঘোষণা করা হ'ল রাজাই সকল জমির মালিক এবং রাজার কাছ থেকে সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলি জমির স্বত্ব পেয়েছে। নতুন শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্যান্য প্রশাসনিক উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব রইল রাজার উপর। কর হিসেবে প্রজাদের উৎপন্ন ফসলের একাংশ রাজাকে দেওয়ার রীতি প্রচলিত হ'ল। ৭০১—৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানে তাই হো বিধি চালু করা হল। এই বিধির দ্বারা তাং বংশের আমলে চীনে প্রচলিত বিস্তৃত কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে এক শাসন-ব্যবস্থা রচিত হয়েছিল।

**সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির বাধাপ্রদান**—চীনে যেরকম শক্তিশালী রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল জাপানে ঠিক সেরকম করা সম্ভব হয়নি। অভিজাত পরিবারগুলি ছিল রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তাদের ছিল প্রবল আপত্তি। রাজা তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য প্রশাসনিক উচ্চপদে অভিজাত পরিবার থেকেই কর্মচারী নিয়োগ করতেন। জাপানে এত সব সাংবিধানিক সংস্কার হলেও সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির কর্তৃত্ব বিলোপ করা সম্ভবপর হয়নি। চীনে কি ভাবে পরীক্ষা দ্বারা গুণগত যোগ্যতা বিচার করে প্রশাসক নিয়োগ করা হ'ত, তা আমরা আগেই জেনেছি। জাপানে কিন্তু বংশকৌলীন্য ছিল উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগের মাপকাঠি।

**মিকাডো—সিণ্টোধর্মের প্রধান পুরোহিত ও স্বৈরাচারী রাজা**—জাপানীদের আদি ধর্মের নাম সিণ্টো ধর্ম। সিণ্টো কথাটা চীনের—মানে দেবতাদের পথ। প্রকৃতি-পূজা আর পূর্ব-পুরুষ পূজা—এই দুই-এর সংমিশ্রণে এই ধর্ম। সিণ্টো ধর্মের মূলকথা, 'দেবতাদের পূজা কর এবং তাদের বংশধরদের প্রতি অনুগত থাকো'। সম্রাটকে জাপানীরা সূর্যের বংশধর বলে মনে করত। তাছাড়া সম্রাটই ছিলেন সিণ্টোধর্মের প্রধান পুরোহিত। যাতে তাঁর প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য অটুট থাকে সেইজন্য যথারীতি

ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি প্রধান রইলেন। সংস্কারকরা ভেবে দেখেছিলেন যে এর ফলে জাপানে সম্রাটের নিরঙ্কুশ স্বৈরাতান্ত্রিক ক্ষমতা স্থাপনে সুবিধে হবে।

সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির ও বৌদ্ধমঠগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি—জাপানে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের নিয়ম ছিল অদ্ভুত। জাপানী চাষীদের উৎপাদিত প্রধান ফসল হল চাল। চাষীরা যেসব জমিতে চাল উৎপন্ন করত তার উপর কর ধার্য করা হ'ত। প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত অভিজাতদের জমি রাজস্বের আওতার বাইরে ছিল। এর ফলে চাষীদের দেয় করের পরিমাণ ছিল খুবই বেশী। করের বোঝা বহন করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে চাষীরা তাদের জমি-জমা অভিজাত আমলাদের কাছে বিক্রী করে দিতে বাধ্য হ'ল। এতে রাজস্বের পরিমাণ কমে যাওয়ায় রাজতন্ত্রের ক্ষমতা গেল কমে; আর অন্যদিকে অভিজাত-পরিবারগুলি আবার প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠল। জাপান সম্রাট হয়ে পড়ল তাদের হাতের পুতুল। যেসব চাষীরা জমি ছেড়ে দিয়েছিল, জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা জমিদারদের অধীনে কাজ করতে আরম্ভ ক'রল।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেক জাপানী-বৌদ্ধ মৃত্যুকালে তার যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি বৌদ্ধ-মঠে দান করে যেত। তাছাড়া সম্রাট ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের পুণ্য অর্জনের জন্য বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের অর্থ-দানতো ছিলই। এর ফলে বৌদ্ধ-মঠগুলি প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়। তারা তাদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে এবং রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করে। ৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ড কিয়ো' নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হঠাৎ ক্ষমতা দখল করে এবং নিজেকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীরূপে ঘোষণা করে। অবশেষে রাজ্যের অভিজাতদের সাহায্যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। বৌদ্ধ-মঠগুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট 'কাম্মু' তাঁর রাজধানী 'নারা থেকে কিয়োটোতে' স্থানান্তরিত করেন।

কিন্তু কিয়োটোতে রাজধানী পত্তন করলেও জাপানে অভিজাত গোষ্ঠীর জন্য শক্তিশালী রাজতন্ত্র স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। সম্রাট ছিলেন নামে-মাত্র সম্রাট। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির হাতে।

ফুজিয়ারা সামন্ত পরিবার ছিল খুবই প্রতাপশালী। এই সামন্ত পরিবার রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। কোন নাবালক রাজা সিংহাসনে আরোহণ করলে ফুজিয়ারারাই রাজ-প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করত। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে এদেরই লোককে নিয়োগ করা হ'ত। যে সব জমিদার ফুজিয়ারা পরিবারভুক্ত নয় তারা রাজ্যের দূরতম প্রদেশগুলিতে বাস করত। সেইখানে তারা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করতে আরম্ভ করল। এইসব জমিদারদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ীত্বের জন্য কোন মাথা ব্যথা ছিল না। বরং তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এইসব নতুন ক্ষমতাশালী সামন্ত পরিবারদের মধ্যে টায়রা, মিনামতো, যুগাওয়ারা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এদের দমন করার মত ক্ষমতা মিকাডোর ছিল না। ক্ষমতা দখলের জন্য টায়রা ও মিনামতো বংশের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকত। এই অবস্থায় কিয়োটোর রাজবংশ দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল।

শোগান—মিনামতো বংশের ইয়োরিতমো টায়রা পরিবারকে ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাই-নো উরা'র নৌ-যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সম্রাট তাকে শোগান উপাধিতে ভূষিত করলেন; এর অর্থ 'সৈন্যাধ্যক্ষ'। ইয়োরিতমো সমুদ্রের ধারে 'কামাকুরা'তে বাস করতে আরম্ভ করলেন। বাইরে থেকে দেখতে গেলে রাজধানী কিয়োটোতে সম্রাট তখনও যথারীতি দেশ শাসন করছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সম্রাটের তখন কোনো ক্ষমতাই ছিল না। যদিও ইয়োরিতমোকে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ উপাধি দিয়েছিলেন বাস্তবে কিন্তু সম্রাটের কোন সৈন্যদলই ছিল না। আসলে ইয়োরিতমো ছিলেন সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী এক সামন্তজোটের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে এই সামন্তচক্রই দেশের প্রকৃত শাসক হয়ে উঠেছিল। ইয়োরিতমোর পরে শোগান উপাধি দেওয়ার ব্যাপারেও সম্রাটের কর্তৃত্বের আর কোন প্রশ্ন রইল না। এই উপাধি বংশানুক্রমিক হ'য়ে উঠল। এইভাবে আরম্ভ হ'ল শোগান রাজত্ব।

সামুরাই—জাপানে যোদ্ধৃশ্রেণীকে বলা হ'ত সামুরাই। সামুরাই শ্রেণী আবার ছিল কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। সবচেয়ে উপরের স্তরে ছিলেন শোগান;

আর সবচেয়ে নীচের স্তরে সাধারণ পদাতিক সৈনিক। সামুরাইদের সামাজিক পদমর্যাদা ছিল যথেষ্ট। যুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধ করত। তাদের পক্ষে অন্য কোন প্রকার কায়িক শ্রম করা ছিল খুবই নিন্দাজনক। যখন যুদ্ধ চলত না তখন তাদেরও কোন কাজকর্ম থাকত না। সমাজে তারা ছিল বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী। সামুরাইদের কোন প্রকার কর দিতে হ'ত না। যে জমিদার-প্রভুর অধীনে সামুরাই কাজ করত তার কাছ থেকে সে নিয়মিত বৃত্তি হিসেবে চাল পেত। তার ফলে সামুরাইদের খাওয়া-পরার কোন চিন্তা ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তাদের পক্ষে ছিল খুবই গৌরবের কাজ। বলা বাহুল্য যে, এই সামুরাই শ্রেণী ছিল খুবই নিপুণ-যোদ্ধা। জাপানে যে সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হয়েছিল সামুরাই শ্রেণী ছিল তারই ভিত্তিস্বরূপ।

জাপানী শিভালরি ( বুসিডো )—জাপানে সামুরাই শ্রেণীর আচরনীয় বিধিকে বলা হ'ত বুসিডো। বুসিডো পালন করাই ছিল সামুরাইদের ধর্ম। সামুরাইগণ পার্থিব লাভ-ক্ষতি গ্রাহ্য ক'রত না। তারা কাউকে টাকা ধার দিত না, এমন কি টাকা গুণত না। জীবনপণ করেও তারা প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেষ্টা ক'রত। কেউ তাদের কাছে উচিত কারণে সাহায্যের আবেদন করলে জীবন বিপন্ন করেও তারা তাকে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ ক'রত না। কৃচ্ছ্রতা সহকারে কঠোর জীবন যাপন করাই ছিল তাদের নীতি। কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য অনেক সময় তারা একবেলা আহার গ্রহণ ক'রত। সকল বেদনা ও যন্ত্রণা তাদের নীরবে সহ্য করতে হ'ত। যে কোন প্রকার উচ্ছ্বাস দমন করাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। প্রভুর প্রতি আনুগত্য ছিল তাদের জীবনের একমাত্র ধর্ম। প্রভুর মৃত্যু হলে অনেক সময় সামুরাই পেটে ছুরি মেরে আত্মঘাতী হ'ত। একে বলা হ'ত হারাকিরি। প্রভুর মৃত্যুর পরেও যাতে তাকে সেবা করা যায় সেইজন্য এই আত্মহত্যার ব্যবস্থা। জাপানী সামুরাইদের যে কঠোর জীবন যাপন করতে হ'ত মধ্যযুগের ইউরোপে নাইটের জীবন যাপনের সঙ্গেও তার তুলনা করা চলে না।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

(১) তাং-তাই-সুংএর রাজ্য-বিজয় সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। (২) তাং-তাই-সুং কি ধরনের শাসন সংস্কার করেছিলেন? (৩) চীনাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর। (৪) ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয় কি কি ছিল? (৫) তাং যুগের সাহিত্য রচনা সম্পর্কে যা জান লেখ। (৬) তাং যুগের চিত্র-শিল্প সম্পর্কে কি জান? (৭) চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিভাবে হয়েছিল? (৮) হিউয়েন সাং-এর ভারত ভ্রমণের ফলাফল কি? (৯) সুং যুগের সাহিত্য সম্পর্কে লেখ। (১০) সুং যুগে চীনে বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল কেন? এতে কি উপকার হয়েছিল? (১১) কুবলাই খাঁ কে? তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন কি ছিল? (১২) মার্কোপোলো পিকিং সম্বন্ধে কি লিখেছেন? (১৩) মধ্যযুগের প্রথম দিকে জাপানের সমাজব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি কি ধরনের ছিল? (১৪) মধ্যযুগের জাপানে শাসন সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়েছিল? (১৫) বৌদ্ধমঠগুলি কিভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল? (১৬) শোগান কাকে বলা হয়? শোগান-রাজত্ব কিভাবে আরম্ভ হল? (১৭) কাদের সামুরাই বলা হত? তাদের কাজ কি ছিল? (১৮) সামুরাই শ্রেণীর আচরণীয় বিধি সম্পর্কে যা জান লেখ।

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

**এককথায় উত্তর দাও :** ১। তাং বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম কি? ২। তাই সুং-এর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কত ছিল? ৩। চীনের 'রাফায়েল' কাকে বলা হয়? ৪। সুং যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন বিধি কে চালু করেছিলেন? ৫। সুং যুগের একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের নাম কি? ৬। তেমুচিন কি উপাধি নিয়েছিলেন? ৭। জাপানের আদিম অধিবাসীদের নাম কি? ৮। জাপানে রাজাদের উপাধি কি ছিল? ৯। 'জাপানী সভ্যতার জনক' কাকে বলা হয়? ১০। জাপানে আদি ধর্মের নাম কি?

**ডানদিকে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটিতে দাগ দাও :**

১। ভৌগোলিক প্রকৃতি অনুসারে তাং তাই সুং সমগ্র দেশকে ভাগ করেছিলেন ( দশটি তাও এ / দশটি চৌ এ / দশটি সিয়েনে )।

২। লি-পোর সমগ্র রচনাবলী বিভক্ত মোট ( ১০ খণ্ডে / ২০ খণ্ডে / ৩০ খণ্ডে )।

৩। লুং মেনের গুহা মন্দিরে বৈরোচন বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (তাং-তাই-সুং / মেং-হো-যান / সম্রাজ্ঞী উ)।
৪। সুং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম (চাও-কুয়াং-ইন্ / সেন সুং / ওয়াং আন্ সি)।
৫। কুবলাই খাঁ চীনের সম্রাট হন (১২২৭ খ্রীঃ / ১২৫০ খ্রীঃ / ১২৮০ খ্রীঃ)।
৬। কুবলাই খাঁ বিশ্বাসী ছিলেন (খ্রীষ্টানধর্মে / তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে / ইসলাম ধর্মে)।
৭। প্রথমে জাপানে রাজত্ব করত (ইয়ামতো পরিবার / মিনামতো পরিবার / টায়রা পরিবার)।
৮। রাজধানী নারা কিয়োটোতে স্থানান্তরিত করেন (কাম্মু / শোতুকু-তাই-সি / ফুজিয়ারা)।
৯। শোগান উপাধির অর্থ (প্রধানমন্ত্রী / সৈন্যধ্যক্ষ / প্রধান বিচারপতি)।
১০। জাপানে সামুরাই শ্রেণীর আচরণীয় বিধির নাম (বুসিডো / হারাকিরি / সিন্টো)।

**ভুল বাক্যগুলিকে ঠিক করে লেখ :** (১) সি—ইউয়ান ইতিহাসে তাই জু নামে পরিচিত। (২) তু-ফুর রচনাতে কনফুসীয় আদর্শ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। (৩) লুংমেনের গুহামন্দিরে জগতের প্রাচীনতম ছাপা একটি বৌদ্ধগ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছে। (৪) বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের চীনা ভাষায় যারা অনুবাদ করেছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিউয়েন সাং। (৫) চীন থেকে ফেরার পথে মার্কোপোলো জাপান ও তিব্বতে গিয়েছিলেন। (৬) জাপানে গুনগত যোগ্যতাই ছিল উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগের মাপকাঠি। (৭) জাপানে সিন্টো কথাটির মানে ঈশ্বরে অনুগ্রহ। (৮) ইয়োরিতমো ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কিয়োটার নৌ-যুদ্ধে টায়রা পরিবারকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করলেন। (৯) সামুরাই শ্রেণী চাষবাস করত। (১০) প্রভুর মৃত্যু হলেও অনেক সামুরাই তার সম্পত্তি দখল করত।

# একাদশ অধ্যায়

# মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

পাঠ-সংকেত – গুপ্ত পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ (৫ম—৭ম শতক) ● ভারতে হূন আক্রমণ ● গুপ্ত বংশের পতন ● হর্ষবর্ধনের আমল ● উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন ● হিউয়েন সাং-এর ভারত ভ্রমণ ● ভ্রমণ বৃত্তান্ত ● নালন্দা ● হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে ভারত (৮ম—১২শ শতক) ● বাংলা-বিহারের পালবংশ ● কাশ্মীরের কার্কোট বংশ ● গুর্জর প্রতিহার বংশ ● দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ● রাজপুত ● রাজপুতানায় সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীগত প্রাধান্য স্থাপন ● পাল-প্রতীহার-রাষ্ট্রকূট : ত্রিপাক্ষিক সংঘর্ষ ● সাম্রাজ্যের পতন ● ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ● বাংলাদেশের ইতিহাস ● শশাঙ্ক ● পাল-সেন আমলে বাংলাদেশের জীবন-যাত্রা ও সমাজ-ব্যবস্থা ● দক্ষিণ ভারত ● পল্লব বংশ ● বাতাপীর চালুক্য বংশ ● পল্লব ও চালুক্য যুগের শিল্প ● চোল বংশের সামুদ্রিক কার্যকলাপ।

## ॥ গুপ্ত পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ (৫ম—৭ম শতক) ॥

গুপ্তবংশের সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দ বাহুবলে ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ অংশের অধীশ্বর হয়েছিলেন। এই বংশের প্রবল প্রতাপ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত টিকে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। এই সময় বাইরে থেকে হূণ আক্রমণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ উত্তর ভারতের বিশাল এক অংশে সাম্রাজ্য গঠন করে।

ভারতে হূণ আক্রমণ—গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হূণরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত অবশ্য যুদ্ধে হূণদের পরাস্ত করেন। তাই সাময়িকভাবে ভারতবর্ষ এই দুর্ধর্ষ জাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পায়।

এই হূণদের পরিচয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। হূণরা ছিল যাযাবর।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তাদের চীনের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করতে দেখা যায়। তারপর সেখান থেকে তারা পশ্চিম দিকে যাত্রা করে। তাদের একটি শাখা রোমান সাম্রাজ্যে উপস্থিত হয়; অপর একটি শাখা অক্ষু উপত্যকা অতিক্রম করে পারস্য ও ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষে স্কন্দগুপ্তের কাছে তারা পরাজিত হয় কিন্তু ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য তাদের দখলে আসে। এই সময়ে পারস্য থেকে খোটান পর্যন্ত অঞ্চলে হূণদের অধিকার বিস্তৃত হয়। তাদের রাজধানী ছিল আফগানিস্তানের বামিয়ান। প্রথম উল্লেখযোগ্য হূণ সর্দার ছিলেন তোরমান। তিনি পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপুতানা, উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ এবং মধ্যভারতে এরণ পর্যন্ত ভূ-ভাগের অধিপতি হন। তোরমানের পর তাঁর পুত্র মিহিরকুল হূণদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। দীর্ঘদিন উত্তর ভারতে হূণদের আধিপত্য স্থায়ী হয়নি। মধ্যভারতে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যায়, গুপ্তরাজারা ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে কখনও নিজেদের চেষ্টায় কখনও বা অন্যান্য রাজাদের সহায়তায় হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মিহিরকুল সমভূমি অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে কাশ্মীরে আশ্রয় নেন। ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে হূণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

হূণদের ভারতবর্ষ আক্রমণ ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমতঃ, স্কন্দগুপ্তের পর থেকে গুপ্ত রাজবংশ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছিল। তবু আরও বেশ কিছু সময় হয়তো গুপ্তরাজারা রাজত্ব করতেন। কিন্তু হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে গুপ্তরাজারা তাঁদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটেছিল। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় ছোট ছোট রাজ্যের শাসকগণ হয়তো নিজেদের মধ্যে যোগ্য কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। এই সুযোগে বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ, ভারতে হূণ আক্রমণের সময়ে হূণদের সঙ্গে মধ্য এশিয়া থেকে আরও অন্য উপজাতিভুক্ত মানুষও ভারতে এসেছিল। তারা ভারতের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। রাজস্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা এইসব উপজাতিদের ভয়ে পালিয়ে যায়

এবং সেখানে এই উপজাতিরা বসবাস শুরু করে। ঐতিহাসিক মহলের ধারণা যে বর্তমানের রাজপুতরা এদেরই বংশধর।

গুপ্তবংশের পতন—গুপ্ত রাজবংশের পতনের পরে ভারতবর্ষ জুড়ে আবার এক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গুপ্তদের আমলে যারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিল তাদের অনেকেই স্বাধীন রাজবংশ স্থাপন করে। তার ফলে গুপ্ত পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। উত্তর ভারতে ষষ্ঠ শতকে প্রধান চারিটি রাজ্য ছিল—(১) মগধের গুপ্তবংশ, (২) কনৌজের মৌখরী বংশ, (৩) থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ ও (৪) বল্লভীর (বর্তমান সৌরাষ্ট্র) মৈত্রক বংশ। এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই সব সময় লেগেই থাকত। মগধের গুপ্তরাজারা ও কনৌজের মৌখরীরা ছিল পরস্পরের শত্রু। খুব সম্ভবতঃ মৌখরী রাজারা গুপ্তদের মগধ থেকে মালবে তাড়িয়ে দেয়। মালবের গুপ্তদের সঙ্গে পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকর বর্ধনের সম্পর্ক ভাল ছিল না। কনৌজের রাজা গ্রহবর্মন থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। ফলে উভয় রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। হয়তো গুপ্তদের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসার রোধ করাই ছিল এই বৈবাহিক সম্পর্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মালবের দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে কনৌজ আক্রমণ করলেন এবং গ্রহবর্মনকে হত্যা করে ঐ রাজ্য দখল করলেন। প্রভাকর বর্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন আবার দেবগুপ্তকে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি নিজে নিহত হয়েছিলেন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হাতে।

হর্ষবর্ধনের আমল—পিতা প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পরে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সভাকবি বাণভট্ট হর্ষের জীবন কাহিনী তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। এছাড়া চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং-এর লেখা থেকেও হর্ষবর্ধন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

সিংহাসনে আরোহণ করে কনৌজের দিকে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হয়েছিলেন।

তখন কনৌজের প্রধান মন্ত্রী পোনি ও রাজ্যের অন্যান্য অভিজাতদের অনুরোধে তিনি কনৌজ শাসনে রাজী হলেন। এরপর কনৌজই হল তাঁর রাজ্যের রাজধানী। হর্ষবর্ধন দীর্ঘ ৪১ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই রাজত্বকালের বেশীরভাগ সময়ই তিনি যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। তার ফলে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়। জলন্ধর, কাশ্মীর, নেপাল ও বল্‌ভীর সামন্ত-রাজারা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। উড়িষ্যাকেও তিনি তাঁর নিজের অধীনে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। সিন্ধু অঞ্চলেও তাঁর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। হর্ষবর্ধন অবশ্য দাক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হননি ; বরং দক্ষিণ ভারতে বাতাপীর চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন।

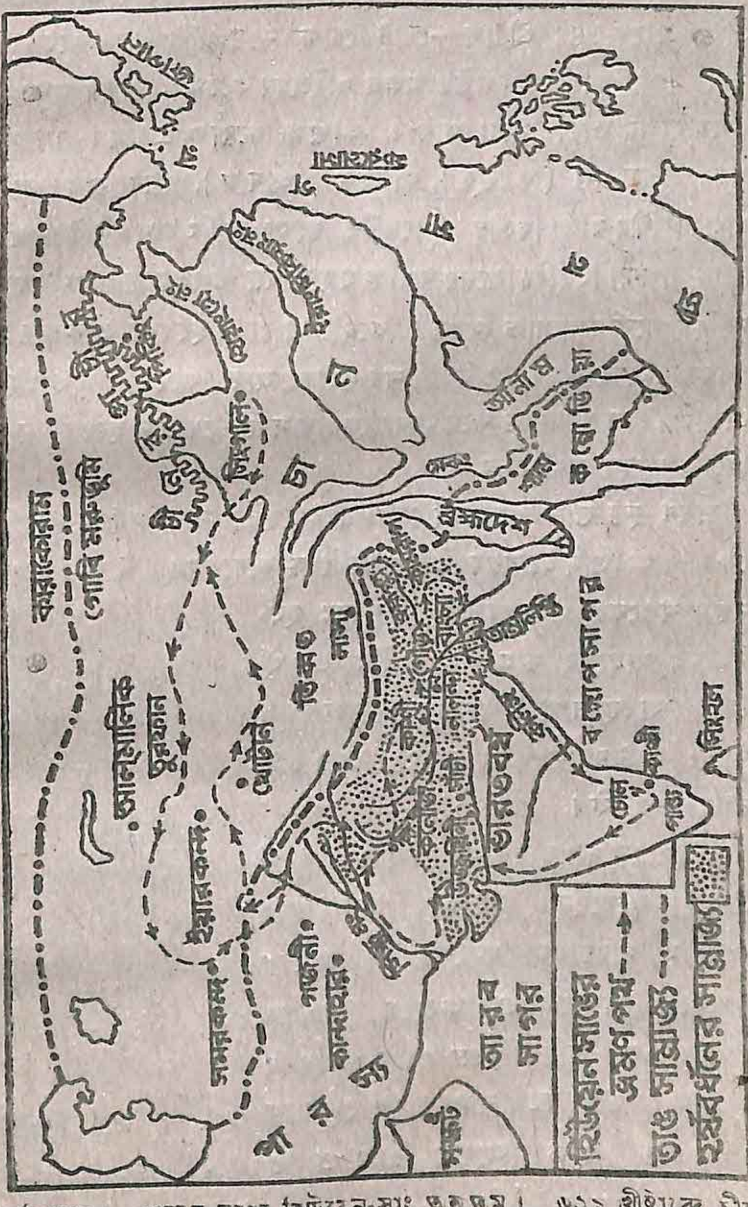


সম্রাট হর্ষবর্ধন

উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন—হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের আয়তন শুধু উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্বে উড়িষ্যার গঞ্জাম থেকে পশ্চিমে বল্‌ভী (গুজরাট), উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে নর্মদা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগে তিনি তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে উত্তর ভারতের সকল অংশই তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কিছু কিছু অঞ্চল ছিল সামন্ত-রাজা শাসিত। দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপিতে হর্ষকে 'সকলোত্তর পথনাথ' অর্থাৎ 'সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হর্ষবর্ধন নিজে খুবই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর সভায় প্রচুর জ্ঞানী-গুণী ভীড় করত। তাঁর সভাকবি ছিলেন বাণভট্ট। হর্ষচরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থ বাণভট্টের রচনা। হর্ষ নিজেও ছিলেন একজন সুলেখক। 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনখানি সংস্কৃত নাটক তিনি রচনা করেছিলেন।

হিউয়েন-সাং-এর ভারত ভ্রমণ—চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য চীন দেশ থেকে অনেক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে




এসেছিলেন। এদের মধ্যে হিউয়েন-সাং অন্যতম। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে তুরফান, কুচা প্রভৃতি রাজ্য ঘুরে তিনি হিন্দু-

কুশ পর্বতের দক্ষিণে কপিশাতে ( কাফ্রিস্তান ) পৌঁছান। এই পথ অতিক্রম করতে তাঁর প্রায় বছর খানেক সময় লেগেছিল। তিনি ভারতবর্ষে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ—মোট চৌদ্দ বছর অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। যেসব অঞ্চলে তিনি গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কনৌজ, প্রয়াগ ( এলাহাবাদ ) মগধ, তাম্রলিপ্ত ( তমলুক ), কামরূপ ( আসাম ), পল্লব রাজধানী কাঞ্চী, চালক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য অর্থাৎ মহারাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাস্থবির শীলভদ্রের নিকট যোগাচার দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন ও কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মনের কাছে তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করেন। হর্ষবর্ধন তাঁর প্রত্যাবর্তনের বন্দোবস্ত করে দেন। ফেরার সময়ে খোটান হয়ে তিনি চীনের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত—ভারতবর্ষে যেসব রাজ্য হিউয়েন-সাং পর্যটন করেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি মনোরম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে সপ্তম শতকের ভারতবর্ষের বিশেষতঃ হর্ষবর্ধনের আমলের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। হিউয়েন-সাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তের চীনা নাম সি-উ-কি।


চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং

হিউয়েন-সাং হর্ষের শাসন ব্যবস্থায় ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হর্ষবর্ধন অনলসভাবে রাজকার্য 'পরিচালনা করতেন'। প্রজাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করতেন। তার ফলে শাসনকার্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হ'ত আবার রাজা-প্রজার সম্পর্কও মধুর হয়ে উঠেছিল।

হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ থেকে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার মোটামুটি

পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যের অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী। তারা উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ কর হিসেবে রাজাকে দিত। হর্ষবর্ধন জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ বরাদ্দ করেছিলেন সরকারী খরচের জন্য। আর এক-চতুর্থাংশ ছিল রাজ কর্মচারীদের বেতন মেটানোর জন্য। তবে সবসময় বেতন বাবদ অর্থ দেওয়া হ'ত না। অর্থের পরিবর্তে কর্মচারীদের জমি দেওয়া হ'ত। এক-চতুর্থাংশ আয় সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। দান, খয়রাত, উপহার প্রভৃতি বাবদে খরচ হ'ত অপর এক-চতুর্থাংশ। বিনা বেতনে কোন প্রজাকেই খাটতে হ'ত না। রাস্তা-ঘাটের উন্নতির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ব্যাপক উন্নতি ঘটে। পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাতায়াতের সময় বণিকদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করা হ'ত। শ্রমের অনুপাতে শ্রমিকরা মজুরী পেত। গ্রামগুলি ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ভারতবাসীরা এই সময়ে নানারকম ফসল ও তরি-তরকারীর চাষ করত। হিউয়েন-সাং লিখেছেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে আখ ও গম চাষ করা হ'ত; মগধ ও আরও পূর্বদিকে প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ছিল ধান। এই সময়ে বিভিন্ন ফলের উৎপাদনও চীনা পরিব্রাজক লক্ষ্য করেছেন।

হিউয়েন-সাং-এর লেখা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর সময়ে ভারতে বয়নশিল্প ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সিল্ক, উল, সুতি, ক্ষৌমবস্ত্র, ছাগলের লোম থেকে উৎপাদিত বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। মথুরার সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ এই সময়ে ধাতুশিল্পে খুবই উন্নত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা পাওয়া যেত। নেপাল ও কুলু উপত্যকা তামার খনির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তামা ও পিতল দিয়ে মূর্তি ও মন্দির তৈরী হ'ত। নালন্দায় হিউয়েন-সাং ৮০ ফুট এক তামার বুদ্ধ মূর্তি দেখেছেন। সেইসময়ে তিনি সেখানে বিশালাকার একটি পিতলের মন্দির নির্মিত হতে দেখেন। রাজা শিলাদিত্য (হর্ষ) ছিলেন মন্দিরটির নির্মাতা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত হিউয়েন-সাং-এর আমলে

বন্দর হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। স্থলপথে ও জলপথে সব জায়গার সঙ্গেই তাম্রলিপ্তের যোগাযোগ ছিল। হিউয়েন-সাং লিখেছেন যে পূর্ব ভারত থেকে সব পণ্যদ্রব্যই তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে সাগর পারের দেশগুলিতে রপ্তানী হত।

ওড্র দেশে (উড়িষ্যায়) চরিত্র নামে একটি বন্দরের নাম চীনা পরিব্রাজক উল্লেখ করেছেন।

ভারতবাসীর সরল ও অনাড়ম্বর জীবন হিউয়েন-সাংকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেছেন ভারতবাসী প্রতারণা কাকে বলে জানে না। সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাপ করলে পরকালে তার ফলভোগ করতে হয়—এ বিশ্বাস তাদের প্রবল ছিল। ভারতবর্ষ বিলাসিতা পছন্দ করত না। সেই সময়ে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হ'ত। গুরুতর অপরাধ করলে নাক, কান কেটে শহর থেকে তাকে বহিষ্কার করা হ'ত। তবে গুপ্তযুগের তুলনায় হর্ষবর্ধনের আমলে চুরি-ডাকাতি বেড়ে গিয়েছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কনৌজ ছিল উত্তর ভারতের সর্বপ্রধান নগর। হিউয়েন-সাং-এর বর্ণনা অনুযায়ী এই নগর দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত। এই সুবৃহৎ নগর প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজে এক বিরাট ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। হিউয়েন-সাং এই ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, এই ধর্মসভায় সামন্ত ও মিত্র রাজগণ উপস্থিত থেকে হর্ষকে সম্রাটরূপে সম্মান দেখান। বুদ্ধের এক স্বর্ণ-প্রতিকৃতি সামনে রেখে বিরাট শোভাযাত্রা হয়। হর্ষ বুদ্ধের মূর্তির অর্চনা করেন। ১৮ দিন ব্যাপী এই ধর্মসভার অধিবেশন চলে। এই সভায় মহাযান বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করা হয়। বৌদ্ধ ছাড়া জৈন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও এখানে উপস্থিত ছিলেন। হর্ষবর্ধনের আমলে প্রয়াগে (এলাহাবাদ)—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি মেলার আয়োজন করা হ'ত। হিউয়েন-সাং এরকম একটি মেলায় উপস্থিত ছিলেন। এই মেলা চলেছিল মোট ৭৫ দিন। প্রথম দিনে বুদ্ধ, দ্বিতীয় দিনে সূর্য ও তৃতীয় দিনে শিবের উপাসনা করা হয়। এই সময়ে হর্ষ সাধু-সন্ন্যাসী ও গরীব-দুঃখীদের অকাতরে দান করতেন।

হিউয়েন-সাং কনৌজ ছাড়া পাটলীপুত্র ও বারানসী নগর পরিভ্রমণ করেছেন। বারানসী নগর দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। এই নগরী ছিল জনবহুল। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্ররূপে বারানসী প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও বহু বৌদ্ধ মঠ সেখানে ছিল।

**নালন্দা**—খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষ শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

করেছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে যেমন মঠের সংলগ্ন বিদ্যালয় ছিল, ভারতবর্ষেও তেমনি প্রায় প্রতিটি বৌদ্ধমঠই শাস্ত্র-শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথমে নালন্দা ছিল এরূপ একটি বৌদ্ধমঠ। গুপ্তযুগের নৃপতিদের উৎসাহে ও আর্থিক সাহায্য পেয়ে ক্রমশঃ নালন্দা মঠ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে বিহারে অবস্থিত পাটনার নিকটে বড়গাঁও নামক স্থানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

হিউয়েন-সাং, ইৎ সিং প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকগণের লেখা থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। হিউয়েন সাং-এর সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র। তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্য হিউয়েন-সাংকে মুগ্ধ করেছিল। এখানে শুধু বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রই শিক্ষা দেওয়া হ'ত না; বেদ, বেদান্ত, হিন্দু দর্শন শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, গণিত, ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতিও ছিল অধ্যয়নের বিষয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয়—চীন, তিব্বত, কোরিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেও বহু ছাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য এখানে অধ্যয়ন করত।

হিউয়েন-সাং-এর হিসাব মত নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০,০০০। এই ছাত্রদের মধ্যে সকলেই* খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল না। তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা করে ছাত্রদের ভর্তি করা হ'ত। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছিল বেশ কঠিন। ছাত্ররা সবসময়ই জ্ঞান-চর্চায় অতিবাহিত করত। ছাত্র ও অধ্যাপকদের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রায় একশতটি গৃহ ছিল। এছাড়াও হিউয়েন-সাং আটটি বিরাট হলঘর দেখেছেন। প্রতিটি হলঘরে অন্ততঃ ৩০০টি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। এই বিশাল বিদ্যালয়ের অর্থের প্রয়োজন মেটানো সহজ কথা নয়। হর্ষবর্ধন তাঁর রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বিদ্যাচর্চার জন্য ব্যয় করতেন। হিউয়েন-সাং লিখেছেন যে ১০০টি গ্রামের রাজস্ব নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল।

মুসলমান আক্রমণ পর্যন্ত নালন্দা তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

## ।। হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে ভারত ( অষ্টম—দ্বাদশ শতক ) ।।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়ে আর কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি। তার পরিবর্তে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। ক্ষমতা লাভের জন্য এইসব রাজ্যের রাজারা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। এ যুগে বাংলার পালবংশ, কাশ্মীরের কার্কোট বংশ, গুর্জর প্রতীহার বংশ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

বাংলা-বিহারের পালবংশ—সপ্তম শতকের মাঝামাঝি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে বাংলাদেশে চলেছিল এক চরম অরাজকতা। প্রবলের অত্যাচারে সাধারণ নিরীহ মানুষের ধন-প্রাণ বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দেশের এই অরাজকতা দূর করবার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গোপালকে রাজা-রূপে নির্বাচিত করল। তিনিই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। গোপালের পুত্র ধর্মপাল ( ৭৮০—৮১৫ খ্রীঃ ) ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর বাহু-

---

* The wonder that was India—A. L. Basham, Page 165.

বলে পাল সাম্রাজ্য বাংলা, বিহার ছাড়াও উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। পালবংশ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করে।

**কাশ্মীরের কার্কোট বংশ**—সপ্তম শতকে কাশ্মীরে কার্কোট রাজবংশ বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কল্হন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে জানা যায় যে এই বংশের ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ( ৭৩৪—৭৬০ খ্রীঃ ) ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তিনি গৌড়ের রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। আবার তিব্বত, দর্দ ও তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে কার্কোট রাজবংশের পতন হয় এবং আরম্ভ হয় উৎপল বংশের শাসন।

**গুর্জর প্রতীহার বংশ**—খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে প্রতীহার বংশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। রাজপুতানা অঞ্চলে খুব সম্ভবতঃ এদের আদি বাস ছিল। সেখান থেকে তাদের বিভিন্ন শাখা মালব, ব্রোচ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতীহার বংশের রাজা প্রথম-নাগভট্ট মালবে প্রতীহার বংশ স্থাপন করেন। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও সিন্ধু-দেশের আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করা প্রথম নাগভট্টের প্রধান কৃতিত্ব। আরবদের প্রতিহত করার পর প্রতীহার রাজারা পূর্বদিকে মনোনিবেশ করেন। কনৌজের দখল নিয়ে দীর্ঘদিন তাঁদের পাল ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরাই কনৌজ দখল করেন। প্রথম ভোজ ছিলেন প্রতীহার বংশের অন্যতম শক্তিশালী নৃপতি। ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজ্য পাঞ্জাব থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম সীমান্তে আরব আক্রমণ প্রতিহত করা তাঁর অন্যতম কীর্তি। আরব পর্যটক সুলেমান প্রথম ভোজের সামরিক শক্তি ও শাসন দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে গুর্জর প্রতীহারগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপালকে পরাস্ত করে গজনীর সুলতান মামুদ কনৌজ ধ্বংস করেন।

**দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ**—হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট শক্তির বিকাশ হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দন্তীদুর্গ। রাষ্ট্র-কূটরা দাক্ষিণাত্যের উপরাংশে রাজ্য স্থাপন করেছিল। সুতরাং দক্ষিণাত্যের রাজা হয়েও উত্তর ভারতে তারা অনেকবার অভিযান চালিয়েছে।

কনৌজ নিয়ে তাদের সঙ্গে গুর্জর প্রতীহার ও পাল রাজাদের সঙ্গে প্রায়ই লড়াই হ'ত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রকূট রাজা ছিলেন অমোঘবর্ষ। তিনি মান্যখেটে ( বর্তমান হায়দ্রাবাদে ) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বিদ্বান ও পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'আদিপুরাণ' গ্রন্থের লেখক জীন সেন তাঁর সভায় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় মহাবীর্যাচার্য লেখেন 'গণিত সার সংগ্রহ' নামে একটি গণিত গ্রন্থ। অমোঘবর্ষ নিজেও ছিলেন সুলেখক। কানাড়ী ভাষায় লেখা 'কবিরাজমার্গ' তাঁরই রচনা। তিনি দীর্ঘ চৌষট্টি বছর ( ৮১৪—৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ ) রাজত্ব করেন। দশম শতকের শেষের দিকে রাষ্ট্রকূট বংশের পতন হয়।

রাজপুত—সপ্তম শতকে ভারতের ইতিহাসে প্রথম রাজপুতদের উল্লেখ দেখা যায়। এদের উদ্ভব সম্বন্ধে সঠিক কোন ইতিহাস জানা যায়নি। হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতি মধ্য-এশিয়া থেকে এক সময়ে ভারতে এসেছিল। অনেকে মনে করেন রাজপুতরা এদেরই বংশধর। কালক্রমে বিদেশী জাতিগুলি হিন্দু ও হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভারতীয় হয়ে গিয়েছে। ব্রাহ্মণগণ তাদের 'ক্ষত্রিয়' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তখন বিদেশীদেরও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ত।

রাজপুতনায় সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীগত প্রাধান্য স্থাপন—নবম-দশম শতকে রাজপুতদের রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তখনো তারা ছিল নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এইসব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চারটি গোষ্ঠীর ছিল বিশেষ সম্মান। তারা হ'ল—প্রতীহার ( পরিহার ), চাহমান ( চৌহান ), সোলাঙ্কি ও পরমার ( পাওয়ার )। শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এই চারটি গোষ্ঠীকে বলা হ'ত 'অগ্নিকূল'।

পাল-প্রতীহার-রাষ্ট্রকূট : ত্রিপাক্ষিক সংঘর্ষ—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল থেকেই কনৌজ উত্তর ভারতের প্রধান শহরে পরিণত হয়েছিল। এই শহরের ছিল আলাদা মর্যাদা। তাই হর্ষের পরবর্তীকালের রাজারা কনৌজকে তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। এইভাবে কনৌজের দখল নিয়ে পাল, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের লড়াই লেগে গেল। ইতিহাসে এই লড়াইকে বলা হয় 'ত্রিপাক্ষিক সংঘর্ষ'। রাষ্ট্রকূট নৃপতি ধ্রুব প্রথমে গুর্জর প্রতীহার ও

পাল রাজাদের হারিয়ে দিয়ে দাক্ষিণাত্যে নিজের রাজ্যে চলে যান। প্রতীহাররাও কনৌজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। এই সুযোগে পাল বংশের ধর্মপাল গুর্জর প্রতীহারদের প্রতিনিধিকে কনৌজ থেকে বিতাড়িত করে ঐ অঞ্চল দখল করেন। গুর্জর প্রতীহাররাজ নাগভট্ট কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মপালকে পরাজিত করে কনৌজ কেড়ে নেন; কিন্তু তিনি নিজে রাষ্ট্রকূটদের হাতে পরাজিত হন। এইভাবে লড়াই চলতে থাকে। কনৌজ শেষপর্যন্ত গুর্জর প্রতীহারদের দখলে আসে। রাষ্ট্রকূটরা কনৌজ আক্রমণ করেছিল ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে।

সাম্রাজ্যের পতন—এই সময়ে গজনীর সুলতান মামুদ বারবার ভারত আক্রমণ করেন। পাল, গুর্জর প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট—এই তিনটি বিশাল রাজ্য মামুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এই পারস্পরিক সংঘর্ষের ফল কারও পক্ষে শুভ হয়নি। সব সময় যুদ্ধ করবার জন্য এই তিনটি শক্তিকে বিরাট সেনাবাহিনী পুষতে হয়েছিল। খরচ জোগানোর জন্য প্রজাদের উপর চাপানো হয়েছিল প্রচণ্ড করভার। তার ফলে চারদিকে সামন্তরাজরা বিদ্রোহ করল। এইরূপে রাষ্ট্রকূট, পাল ও গুর্জর প্রতীহার রাজবংশের পতন প্রায় একই সময়ে ঘনিয়ে আসে। উত্তর ভারতে হর্ষের মৃত্যুর পরে যেটুকুও বা রাজনৈতিক ঐক্য ছিল, তা-ও বিনষ্ট হ'ল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব—পালবংশের ধ্বংসের পরে বাংলাদেশে সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজপুত গোষ্ঠীগুলি এবার স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। চৌহানরা দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পূর্ব রাজস্থানে, আর রাজপুত প্রতীহাররা দক্ষিণ রাজস্থানে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে। সোলাঙ্কিদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল কাথিয়াওয়াড়ে। তাদের আত্মীয় পরিবারগুলি ছড়িয়ে পড়ল মালব, চেদি, পাটন ও ব্রোচে। পরমার (পাওয়ার)-রা ছিল রাষ্ট্রকূটদের সামন্তরাজা। পরে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হয়ে যায়। অন্যান্য রাজপুত গোষ্ঠীর মধ্যে খাজুরাহোতে চন্দেল্ল বংশ, মেবারে গুহিল বংশ ও জব্বলপুরের নিকটে ত্রিপুরীর কলচুরি বংশ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে একতা ছিল না মোটেই। তাই আরবদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এরা একজোট হতে পারেনি।

## ॥ বাংলাদেশের ইতিহাস ॥

শশাঙ্ক—বাংলাদেশের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বাধীন রাজার নাম শশাঙ্ক। প্রথম জীবনে শশাঙ্ক ছিলেন খুব সম্ভবতঃ পরবর্তী গুপ্তবংশের নৃপতি মহাসেন গুপ্তের অধীনে একজন সামন্তরাজা। পরবর্তী গুপ্তবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে শশাঙ্ক গৌড়ে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণ-সুবর্ণে। ঐতিহাসিকদের অনুমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের অনতি-দূরে রাঙামাটি গ্রামটিই অতীতের কর্ণ-সুবর্ণ। প্রতিবেশী রাজ্য কামরূপের সঙ্গে শশাঙ্কের শত্রুতা ছিল। সমগ্র বাংলাদেশে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মেদিনীপুর থেকে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ তিনি জয় করেছিলেন। মগধও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মৌখরী বংশের বিরুদ্ধে তিনি মালবের দেবগুপ্তের সঙ্গে জোট বাঁধেন। উভয়ের সম্মিলিত আক্রমণে মৌখরী রাজ গ্রহবর্মন নিহত হন। পুষ্যভূতি বংশের রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে হত্যা করে তাঁর ভগ্নীপতি গ্রহবর্মনের হত্যার প্রতিশোধ নেন। কিন্তু তিনি শশাঙ্কের সঙ্গে পেরে উঠলেন না—তাঁর হাতে তিনি নিহত হলেন। সুতরাং শশাঙ্কের সঙ্গে আজীবন হর্ষবর্ধনের শত্রুতা চলেছিল। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন ও হর্ষবর্ধন খুব সম্ভবতঃ একসঙ্গে দু'দিক থেকে শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। চীনা বিবরণ অনুসারে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার অবশ্য মনে করেন যে, 'শশাঙ্ক শেষপর্যন্ত অপরাজিতই ছিলেন।' যাই হোক, শশাঙ্কের পক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য স্থাপন করা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

### ॥ পাল-সেন আমলে বাংলাদেশের জীবনযাত্রা ও সমাজ-ব্যবস্থা ॥

খাদ্য—এ যুগের মত সে যুগের বাঙালীরও প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। সে যুগের গ্রন্থে বলা হয়েছে—

ওগ্গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুক্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা
দিজ্জই কান্তা খা(ই) পুনবন্তা॥

এর থেকে বুঝা যায় যে কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা

মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক ছিল বাঙালী মাত্রেরই প্রিয় খাদ্য। কিন্তু সামাজিক ভোজে শাক্-সবজি কেউ খুব বেশী পছন্দ করত না। মাছ ও মাংসে বাঙালীর রুচি ছিল। দুধ থেকে তৈরী বিবিধ খাদ্যের প্রচলন ছিল। তবে তৎনকার দিনে ডাল বোধ হয় বাঙালী খেত না।* তখন বাঙালী সমাজে মদ্য জাতীয় পানীয়ের খুবই আদর ছিল।

খেলাধূলা—রাজা বা জমিদারেরা অবসর সময়ে শিকার করতে বেরুতেন। সাধারণ লোকদের মধ্যে কুস্তী ছিল অন্যতম ক্রীড়া। দাবা ও পাশাখেলার প্রচলন ছিল খুবই বেশী। মেয়েরা কড়ি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলায় অভ্যস্ত ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ—পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। পুরুষেরা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরত। সাধারণতঃ তাদের গা থাকত অনাবৃত। তবে উৎসবের দিনে গায়ে চাদর দিত। নারীদের পরিধেয় ছিল শাড়ী। ধনী পরিবারের মেয়েরা অবশ্য ওড়না ব্যবহার করত। প্রয়োজনমত তা ঘোমটার কাজ করত। পুরুষেরা কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যবহার করত।

অলঙ্কার—পাল-সেন যুগে পুরুষ-নারী সকলেই অলঙ্কার পরত। অলঙ্কারের মধ্যে কর্ণকুণ্ডল, কর্ণাঙ্গুরী, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ূর, মেখলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিত্তশালী পরিবারে মণি-মুক্তার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। সাধারণ মানুষকে কিন্তু শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণাভরণ ও ফুলের মালাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত। সোনা, রূপা ছিল তাদের নাগালের বাইরে।

পূজা-পার্বণ—বাঙালীর বারোমাসে তেরো পার্বণ লেগেই ছিল। এইসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নানারকম আমোদ-প্রমোদ ও নাচগানের বন্দোবস্ত করা হ'ত।

বর্ণবিন্যাস—জাতিভেদ আর্য সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে আর্য সভ্যতা প্রসার লাভ করলে এখানেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারটি জাতির উদ্ভব হয়। তাদের সুনির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। কিন্তু পাল-সেন যুগে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বহু নতুন সংকর জাতির উদ্ভব হয়।

* বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

বিভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী ৩৬টি জাতির উল্লেখ 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' দেখা যায়। খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশে এরূপ জাতি-বিভাগ প্রচলিত হয়েছিল। সেনবংশের রাজা বল্লালসেন জাতিভেদ প্রথা বজায় রাখতে 'কৌলীন্য প্রথা'র প্রবর্তন করেছিলেন।

**সমাজে নারীর স্থান**—সেকালে মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথা ছিল না। স্বচ্ছন্দে তারা বাইরে ভ্রমণ করত। তাদের সম্মানের চোখে দেখা হ'ত। অপুত্রক অবস্থায় স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হ'ত।

**ধর্মমত**—পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাই তাঁদের আমলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে পৌরানিক ধর্মেরও বেশ প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ প্রসার ছিল। পাল রাজারা পৌরাণিক ধর্মকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

সেন রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের উৎসাহে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটে। সেই সময়ে শিব, বিষ্ণু, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার বিশেষ প্রচলন হয়।

**শিক্ষা**—পাল ও সেন রাজাদের আমলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও বিশেষ উন্নতি হয়। ধর্মপাল ভাগলপুরের কিছু দূরে গঙ্গাতীরে বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ করেন। নালন্দার মত জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্ররূপে এই মহাবিহারের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহাবিহারের চারদিকে ছিল ১০৭টি ছোট মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয়। এখানে তান্ত্রিক, বৌদ্ধধর্ম ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হত। মোট ১১৪ জন বিশিষ্ট পণ্ডিত এখানে নানান বিষয় পড়াতেন। তিব্বতের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে জ্ঞানলাভের জন্য আসতেন। ছাত্ররা বিনা ব্যয়েই শিক্ষালাভ করতে পারত। এই মহাবিহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। গোপালের আমলে বিহারের ওদন্তপুরী বা উদ্দণ্ডপুরে একটি মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল। এইটি ছিল স্থাপত্য শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন। তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধ-বিহার ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে নির্মিত হয়। এই মহাবিহারটিও ছিল বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র।

॥ দক্ষিণ ভারত ॥

ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশ ও বাদামীর চালুক্য রাজবংশ খ্যাতি লাভ করে। প্রায় তিন'শ বছর এদের প্রাধান্য বজায় থাকে। এই দুইটি শক্তি প্রায়ই নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত।

পল্লব বংশ—পল্লবদের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন যে তারা ভারতের বাইরে পর্থিয়া থেকে দাক্ষিণাত্যে এসেছে। আবার অনেকে মনে করেন যে তারা তামিলনাদেরই আদি বাসিন্দা। কাঞ্চীপুরম ছিল পল্লবদের রাজধানী। পল্লব রাজবংশ বহু পুরানো হলেও প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০—৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এবং নিজে মত্তবিলাস প্রহসন নামে একটি নাটকও রচনা করেন। তাঁর আমলে কাঞ্চী বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র-রূপে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। এই জয়ের ফলে পল্লব রাজ্যের উত্তরাংশ চালুক্যদের দখলে এল। কিন্তু তাঁর পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মন সিংহাসনে আরোহণ করেই দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন। তারপর ৬৪২ খ্রীঃ-এ চালুক্যদের রাজধানী বাদামী দখল করে তিনি 'বাতাপী কোণ্ডা' (বাতাপী বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে দাক্ষিণাত্যে পল্লবদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সিংহলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনি সফল হয়েছিলেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং নরসিংহ বর্মনের রাজত্ব-কালে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে আসেন। তিনি পল্লব রাজ্যের কৃষিসম্পদের প্রাচুর্য ও প্রজাদের সুখী জীবন-যাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন-সাং এখানে বহু বৌদ্ধমঠ, হিন্দু ও জৈন মন্দির দেখতে পান। জনসাধারণের সততা ও সাহসিকতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

নরসিংহ বর্মনের পর পল্লব শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। ৮৯১ খ্রীঃ-এ চোলদের হাতে পল্লবশক্তি ধ্বংস হয়।

বাতাপীর চালুক্যবংশ—চালুক্য বংশের আদি পরিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি। কারো মতে তারা রাজপুতানার গুর্জর জাতির একটি

শাখা; আবার কেউ তাদের কানাড়ী জাতির লোক বলে মনে করেন।

বাতাপীকে (বিজাপুর জেলার বাদামী) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল চালুক্য শক্তি। প্রথম পুলকেশী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তবে দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন বাতাপীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি প্রথমে কানাড়া ও মহীশূরের কদম্ব ও গঙ্গদের পরাস্ত করেন। এরপর তিনি নর্মদা তীরে হর্ষবর্ধনের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। লাট, মালব, গুর্জরও তাঁর দখলে আসে। তাঁর কাছে পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্মনের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। সুদূর দক্ষিণের চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজগণও তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। আইহোল শিলালিপিতে দ্বিতীয় পুলকেশীর কীর্তি বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু হয় পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মনের হাতে। হিউয়েন-সাং দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যেও এসেছিলেন। তিনি পুলকেশীর সামরিক শক্তি ও সুশাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে পুলকেশী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি।

পল্লবরাজ বংশের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অষ্টম শতকে চালুক্য রাজারা দুর্বল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রকূট রাজা দন্তীদুর্গের কাছে শেষরাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মা পরাজিত হলে বাতাপীর চালুক্য বংশের অবসান হয়।

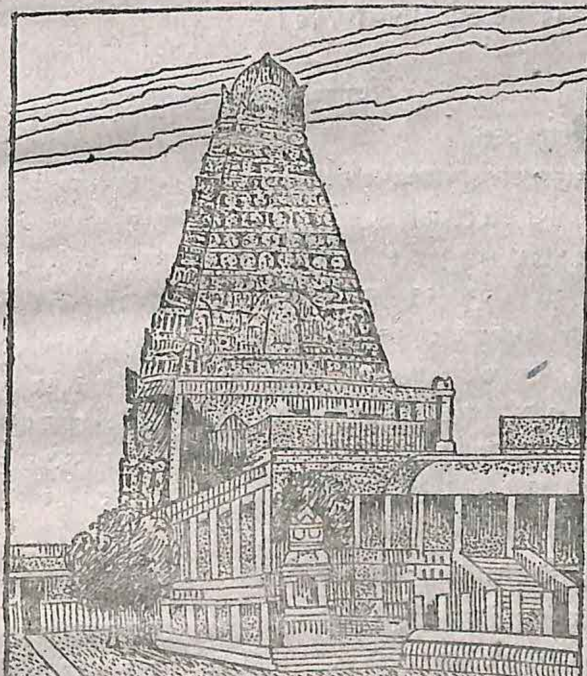
**পল্লব ও চালুক্য যুগের শিল্প**—পল্লব নৃপতিগণ ছিলেন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের আমলে বহু মন্দির নির্মিত হয়। এই সময়ই 'দ্রাবিড় শিল্পরীতি'র উদ্ভব হয়েছিল। কাঞ্চী ও মহাবলীপুরমে পল্লব শিল্পের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। মহাবলী-পুরমে বিরাট পাথরের চাঁই কেটে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলিকে বলা হয় রথমন্দির। পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর নামে এই রথমন্দিরগুলির নামকরণ


মহাবলীপুরমে পল্লব শিল্পের নিদর্শন—রথমন্দির

হয়েছিল। পল্লব আমলে বহু সুন্দর সুন্দর গুহামন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। রাজধানী কাঞ্চীপুরমের ঐরাবতেশ্বর ও কৈলাসনাথ মন্দির পল্লব স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

চালুক্য বংশের আমলেও বহু মন্দির নির্মিত হয়। বিশেষ করে 'মেগুতি' মন্দির ও 'সঙ্গমেশ্বর' মন্দির থেকে চালুক্য ভাস্কর্যশিল্পের উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। চালুক্যদের আমলেও বহু গুহামন্দির নির্মাণ করা হয়।

পল্লব যুগের স্থাপত্য শিল্পের ধারা চোল রাজাদের আমলের শিল্পকীর্তিকে প্রভাবিত করেছিল। চোল নৃপতি রাজরাজ নির্মিত তাঞ্জোরের রাজ-



তাঞ্জোরের রাজ-রাজেশ্বর মন্দির

রাজেশ্বর মন্দিরের স্থাপত্যকৌশল আজও শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চোলবংশের সামুদ্রিক কার্যকলাপ—চোল দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন জাতি। তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লী প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে চোলরাজ্য গঠিত ছিল। দশম শতকে রাজরাজ এবং তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল—এই দু'জন নৃপতি

চোলশক্তিকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। তাঁরা এক বিশাল নৌ-বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সিংহল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চোল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্র চোল বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে শ্রীবিজয়-রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। বর্তমান সুমাত্রা ও দক্ষিণ-মালয় উপদ্বীপ নিয়ে শ্রীবিজয় রাজ্য গঠিত হয়েছিল। নৌ-শক্তি উন্নত হওয়াতে চোল রাজ্যের সঙ্গে সমুদ্রপথে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-গুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কাবেরীপত্তনম্ ছিল চোল রাজ্যের অন্যতম বাণিজ্য-বন্দর।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

(১) হূণদের ভারত আক্রমণের গুরুত্ব নির্ণয় কর। (২) হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের আয়তন কি ছিল? (৩) হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ থেকে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার কি পরিচয় পাওয়া যায়? (৪) ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে হিউয়েন সাং কি মন্তব্য করেছেন? (৫) হর্ষবর্ধনের আমলে কনৌজের ধর্মসভার একটি বিবরণ দাও। (৬) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে যা জান লেখ। (৭) পাল-প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক সংঘর্ষ সম্বন্ধে লেখ। (৮) শশাঙ্কের কৃতিত্ব সম্পর্কে লেখ। (৯) পাল ও সেন আমলে জীবন-যাত্রার চিত্র অঙ্কন কর। (১০) বিক্রমশীলা মহাবিহারে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ। (১১) পল্লব ও চালুক্য বংশের সংঘর্ষের বিবরণ দাও। (১২) পল্লব ও চালুক্য যুগে শিল্পের কতদূর উন্নতি হয়েছিল? (১৩) চোলদের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা কর।

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দাও: (১) ভারতবর্ষে কার রাজত্বকালে প্রথম হূণ আক্রমণ হয়? (২) হর্ষচরিত কার রচনা? (৩) কোন্ শিলালিপিতে হর্ষকে 'সকলোত্তর পথনাথ' বলা হয়েছে? (৪) হিউয়েন-সাং-এর সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নাম কি ছিল? (৫) পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? (৬) কাশ্মীরের কর্কোট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? (৭) প্রথম ভোজ কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (৮) 'গণিত সার সংগ্রহ' কে লিখেছেন? (৯) 'অগ্নিকুল' কাদের বলা হয়? (১০) শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি? (১১) বিক্রমশীলা মহাবিহারের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক কে ছিলেন? (১৩) মহেন্দ্র বর্মনের লেখা সংস্কৃত নাটকের নাম কি? (১৪) বাতাপীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? (১৫) চোল রাজ্যের অন্যতম বাণিজ্য বন্দরের নাম কি?

**নীচের প্রশ্নগুলির ডানদিকে প্রদত্ত সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও :**

১। হুণদের রাজধানী ছিল ( থানেশ্বর / বামিয়ান / দিল্লী )।

২। 'প্রিয়দর্শিকা' নাটক রচনা করেছেন ( বানভট্ট / হর্ষবর্ধন / ময়ূরভট্ট )।

৩। হর্ষবর্ধন সরকারী খরচের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন জাতীয় আয়ের ( এক-চতুর্থাংশ / এক-তৃতীয়াংশ / এক-পঞ্চমাংশ )।

৪। হর্ষবর্ধনের সময়ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে মেলা চলেছিল ( একমাস / আঠারো দিন / পঁচাত্তর দিন )।

৫। হিউয়েন-সাং-এর হিসেব মত নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল ( তিন হাজার / দশ হাজার / পাঁচ হাজার )।

৬। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন ( গোপাল / মহীপাল / ধর্মপাল )।

৭। মালবে প্রতীহার বংশ স্থাপন করেন ( প্রথম নাগভট্ট / ভোজদেব / দ্বিতীয় নাগভট্ট )।

৮। রাষ্ট্রকূটদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন ( ধ্রুব / তৃতীয় গোবিন্দ / অমোঘবর্ষ )।

৯। পালরাজারা ছিলেন ( বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী / জৈন ধর্মাবলম্বী / ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী )।

১০। 'রথমন্দির'-এর নিদর্শন রয়েছে (কাঞ্চীতে / মহাবলীপুরমে / বিশাখাপত্তনমে)।

**শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১। কনৌজের রাজা — থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের — বিবাহ করেন।

২। হর্ষবর্ধন — হেরে গিয়েছিলেন।

৩। হিউয়েন-সাং মোট — ভারতে অতিবাহিত করেন।

৪। হিউয়েন-সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তের চীনা নাম —।

৫। বাংলাদেশের — হিউয়েন-সাং-এর আমলে বন্দর হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল।

৬। — গ্রামের রাজস্ব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল।

৭। রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —।

৮। অমোঘবর্ষ কানাড়ীভাষায় —লিখেছিলেন।

৯। তখনকার দিনে — বোধ হয় বাঙালী খেত না।

১০। বিক্রমশীলা মহাবিহারের চারদিকে ছিল — ও —।

১১। — ছিল পল্লবদের রাজধানী।

১২। রাজেন্দ্র চোল বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে — বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

১৩। — ছিল চোল রাজ্যের অন্যতম বাণিজ্য বন্দর।

**ভুল বাক্যকে ঠিক করে লেখ :**

(১) প্রথম উল্লেখযোগ্য হুণ সর্দার ছিলেন মিহিরকুল। (২) শশাঙ্ক নিজে নিহত হয়েছিলেন রাজ্যবর্ধনের হাতে। (৩) ভারতের জনসাধারণ উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ কর হিসেবে রাজাকে দিত। (৪) নালন্দায় হিউয়েন-সাং ৬০ ফুট উচ্চ

এক পিতলের বুদ্ধমূর্তি দেখেছেন। (৫) বর্তমান বিহারে অবস্থিত রাজগীরে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। (৬) হিউয়েন-সাং প্রথম ভোজের সামরিক শক্তি ও শাসন ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। (৭) পরমার (পাওয়ার)-রা ছিল প্রতীহারদের সামন্ত রাজা। (৮) পাল যুগে সমাজের উচ্চস্তরে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার ছিল। (৯) চীনের প্রথম বৌদ্ধবিহার ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে নির্মিত হয়। (১০) ঐরাবতেশ্বর মন্দির চালুক্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

---

## দ্বাদশ অধ্যায়

# ভারতবর্ষের সঙ্গে বিদেশের সংযোগ

পাঠ-সংকেত—মধ্য এশিয়া ● চীন ● তিব্বত ● দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া ● আঙ্কোরভাট ● আঙ্কোরথম (যশোধরপুর) ● মালয় উপদ্বীপ ও জাভা ● বরবুদুর।

বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সঙ্গে ভারতের বাইরের দেশগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এই যোগাযোগের মূলসূত্র।

মধ্য-এশিয়া—খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণযুগে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ আরম্ভ হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এই যোগাযোগ শুরু হয়। বাণিজ্যপথ ধরেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারকের দল মধ্য-এশিয়ায় হাজির হল। সেখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল। তার ফলে ইয়ারখন্দ, খোটান, কাশগড়, তুরফান, মিরান, কুচি, কারশার ও তুন-হুয়াং-এ বহু বৌদ্ধমঠ নির্মিত হল। ভারতবর্ষ থেকে পুঁথি-পত্র, চিত্র নিয়ে আসা হল এই মঠগুলিতে। খোটান অঞ্চলে বহু ভারতীয় বসবাস করতে শুরু করল। ভারতের বাইরে মধ্য-এশিয়ার বহু স্থানেই ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসার লাভ করল। স্যার অরেল ষ্টেইন এইসব জায়গা খনন করে বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লেখা প্রচুর পুঁথি-পত্র উদ্ধার করেছেন। সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাং মধ্য-এশিয়া দিয়েই চীন থেকে ভারতে গিয়েছিলেন আবার ভারত থেকে চীনে

ফিরেছিলেন। সেই সময়ে তিনি এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করেছেন।

চীন—মধ্য-এশিয়া থেকেই বৌদ্ধধর্ম চীনে বিস্তার লাভ করে। চীনে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রচারক কুমারজীব ছিলেন কুচির অধিবাসী। চীন থেকে বৌদ্ধভিক্ষুর দল বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতে আসতে আরম্ভ করল। বৌদ্ধতীর্থ দর্শন এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করাই ছিল—তাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য। এইসব পর্যটকদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাং ও ইৎ সিং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের শেষ দিকে চীন থেকে একজন দূত কনৌজের রাজদরবারে এসে হাজির হয়েছিলেন। ভারত থেকে শিল্পীর দল বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করতে চীনে উপস্থিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের বাইরের দেশগুলিতে 'মহাযান' মতবাদই প্রচারিত হয়েছিল। চীন থেকে আবার কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে।

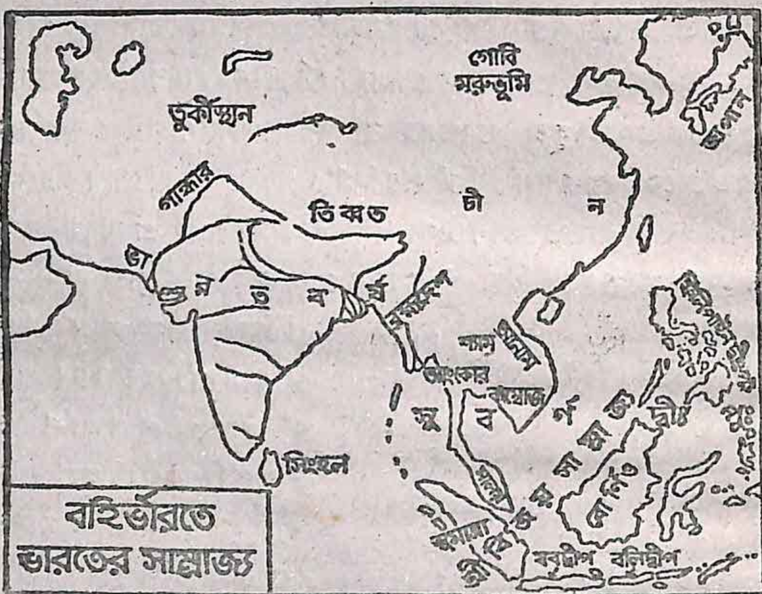

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

তিব্বত—সপ্তম শতকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। তিব্বত ও ভারত পাশাপাশি দেশ। সুতরাং তিব্বতী বৌদ্ধরা দলে দলে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে ভারতে আসত। পাল রাজাদের আমলে পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিপত্তি লাভ করে। বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী মহাবিহার পালযুগে ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। এখানে তিব্বতী ভিক্ষুরা জ্ঞান লাভ করতে আসত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্য। তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বতের প্রধান লামার আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে যান। সেখানে তিনি 'মহাযান বৌদ্ধধর্ম' প্রচার করেন। থো-লিং বিহার ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। তিব্বতেই আনুমানিক ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দীপঙ্করের মৃত্যু হয়।

দীপঙ্করের আগে অষ্টম শতকে বৌদ্ধভিক্ষু শান্তিরক্ষিত পদ্মসম্ভব তিব্বতে

ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে বিখ্যাত লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন এবং অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। শান্তিরক্ষিতের পরে তিব্বতে যান কমলশীল। মোটকথা দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে তিব্বতের সঙ্গে বাংলাদেশের নিবিড় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশ-




বহির্ভারতে ভারতের সাম্রাজ্য

গুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ঘটে। জাতক, বৃহৎকথা, কথাকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে এই বাণিজ্যিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে। এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ভারতের তাম্রলিপ্ত, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি বন্দর থেকে বণিকের দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যাত্রা করত। রোমের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রেই খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় বণিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত আরম্ভ করে। তারা মসলা সংগ্রহ করতে যেত মালয়, জাভা, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া ও বোর্ণিওতে। চীনের সঙ্গে যখন থেকে যোগাযোগ হল তখন থেকেই এইসব স্থানে ভারতীয়দের যাতায়াত বেড়ে গেল। তার কারণ এই যে জলপথে চীনে যেতে হলে এইসব বন্দরগুলি পথে পড়ে। তখন ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে ছিল বহু বন্দর। সেখান থেকে বণিকের দল বিচিত্র

পণ্যসম্ভার নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জগুলিতে যেত; আর ফিরে আসত প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে। সেইজন্যই বোধহয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দ্বীপগুলি ভারতীয়দের কাছে স্তুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল।

বহু ভারতীয় বণিক ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে সুবর্ণভূমিতে বসবাস করতে শুরু করে। আবার অনেক সময় ক্ষত্রিয় রাজপুতরা পিতৃরাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ঐসব অঞ্চলে গিয়ে নতুন রাজ্য স্থাপন করে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এরকম ঘটনার বহু উল্লেখ আছে। এইভাবেই হয়তো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। ঐসব অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা সংস্কৃতিতে অনগ্রসর ছিল। উন্নত ভারতীয় সংস্কৃতি তারা সহজেই গ্রহণ করল।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই সেখানে ভারতীয় নামের শাসকের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, ভাষা, লিপি সবই একান্ত-ভাবে ভারতীয়। সেইজন্য মনে করা হয় যে ঐ অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে মালয় উপদ্বীপে, কাম্বোডিয়া, আনাম্, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে এরকম বহু ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম—দুই ধর্মই এখানে প্রচারিত হয়েছিল।

ভিয়েৎনাম ও কাম্বোডিয়ায় এরকম দু'টি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের নাম—চম্পা এবং কম্বোজ। চম্পা রাজ্যটি ছিল বর্তমানে ভিয়েৎনাম। জয় পরমেশ্বরবর্মদেব ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মন, হরিবর্মন, মহা-রাজাধিরাজ শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মন—এখানকার কয়েকজন রাজার নাম। নাম শুনে মনে হয় যে রাজারা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। তেরো'শ বছর এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল। চম্পা রাজ্যে ছিল বহু নগরী। রাজ্যের সর্বত্র হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

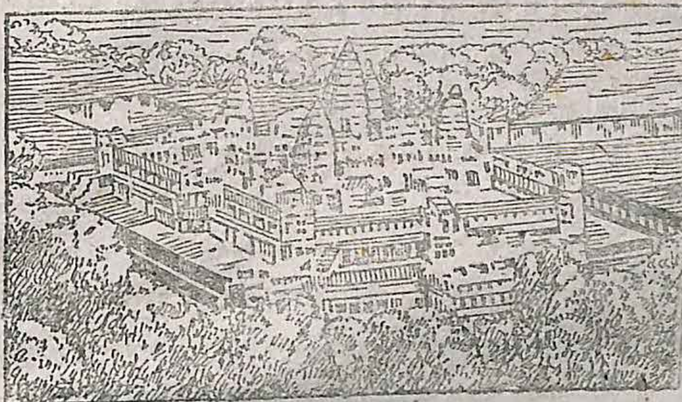
কম্বোজ রাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস সঠিক জানা যায়নি। কিংবদন্তী আছে কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ নাগ-রাজকন্যা সোমাকে বিয়ে করে কম্বোজ রাজবংশের পত্তন করেন। কথিত আছে যে তিনি দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার কাছ থেকে একটি ত্রিশূল লাভ করেছিলেন। আবার কোন কোন কাহিনী

অনুসারে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের আদিত্য বংশের বংশধর। এইসব উপকথা থেকে ভারতের সঙ্গে কম্বোজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। বর্তমান কাম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশে ছিল কম্বোজ রাজ্য। চীনা ভাষায় এই রাজ্যকে বলা হয়েছে ফু-নান। কম্বোজের দক্ষিণ সীমান্তে 'তুয়েন-সিয়েন' নামে একটি রাজ্য ছিল। এইটি ছিল কম্বোজের অধীনে একটি সামন্তরাজ্য। একজন চীনা লেখক তুয়েন-সিয়েন রাজ্যের একটি বিবরণ প্রদান করেছেন। এই বিবরণে বলা হয়েছে—"ভারত থেকে আগত এক হাজারেরও বেশী ব্রাহ্মণ এখানে বাস করে। এখানকার আদি বাসিন্দারা ভারতীয় ধর্মগ্রহণ করেছে এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়েছে। তারা দিনরাত শুধু ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করে।" ফু-নানের রাজা ভারতে ও চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন।

ফু-নানের পতনের পর সেইখানেই আবার কম্বোজ রাজ্য গড়ে-ওঠে। চম্পারাজ্য থেকে এর ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী। জয়বর্মন, যশোবর্মন, সূর্যবর্মন ছিলেন এই রাজ্যের বিখ্যাত রাজা। তাঁরা ছিলেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠে রাজধানী আঙ্কোরথম, আঙ্কোরভাট এবং আরও কয়েক'শ মন্দির।

আঙ্কোরভাট—আঙ্কোরভাটের মন্দির আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি মূলতঃ একটি বিষ্ণু মন্দির। দ্বিতীয় সূর্যবর্মন এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রায় আড়াই মাইল লম্বা একটি খাল মন্দিরটিকে ঘিরে রেখেছে। পরের পর কয়েকটি থাকের উপরে প্রধান মন্দিরটি দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটি থাকই আজ-কালকার দিনের 'গ্যালারি'র মত। সবচেয়ে নীচের থাকের দৈর্ঘ্য ২৬৫ গজ এবং প্রস্থ ২২৪ গজ। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় থাকে উঠতে হয়। আবার দ্বিতীয় থাক থেকে তৃতীয় অর্থাৎ সবচেয়ে ওপরের থাকে সিঁড়ির সাহায্যেই পৌঁছতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় থাক থেকে ১৮০ ফুট উচু আটটি স্তম্ভ আকাশ ভেদ করেছে। সবচেয়ে উপরের থাকে রয়েছে একটি বর্গক্ষেত্রাকার প্রাঙ্গণ। বিষ্ণু মন্দিরটি এই প্রাঙ্গণের মধ্যেই অবস্থিত। মন্দিরটি ২১৫ ফুট উঁচু। প্রতিটি থাক দিয়ে যে 'গ্যালারি' তৈরী করা হয়েছে তাতে ভাস্কর্য শিল্পের প্রচুর নিদর্শন আছে। ভাস্করগণ নিপুণতার সঙ্গে জীবজন্তু, গাছপালা, রামায়ণ ও মহাভারতের নানা দৃশ্য

ফুটিয়ে তুলেছে। আঙ্কোরভাট মন্দির নির্মাণ-শৈলীতে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় মন্দির-শিল্পের প্রভাব পড়েছে।



আঙ্কোরভাটের বিষ্ণু মন্দির

আঙ্কোরথম ( যশোধর পুর)—আঙ্কোরভাটের এক মাইল উত্তরে রাজা সপ্তম জয়বর্মন একটি রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। এই রাজধানীর নাম আঙ্কোরথম। আঙ্কোরথম চারদিকে সু-উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের চারদিকে রয়েছে খাল। রাজধানীতে প্রবেশের জন্য প্রাচীরের গায়েই পাঁচটি বিশাল তোরণদ্বার। তোরণদ্বারগুলিতে রয়েছে অপূর্ব শিল্পশোভার নিদর্শন। দ্বার পেরিয়েই ৩৩ গজ চওড়া রাস্তা দিয়ে রাজধানীর মধ্যে ঢুকতে হয়। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে বেয়নের মন্দির। মন্দিরটি দেখতে পিরামিডের মত। এতে রয়েছে তিনটি থাক। এই থাকগুলির উপরে প্রায় ৪০টি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। তৃতীয় থাকের উপরে কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি উঁচু স্তম্ভ। এর উচ্চতা ১৫০ ফুট। এই স্তম্ভটির চারদিকে ঝুলন্ত বারান্দা। ঝুলন্ত বারান্দার উপরে চারটি অপূর্ব সুন্দর মানুষের মাথা—সে যুগের উন্নত ভাস্কর্য-শিল্পের নিদর্শন। বেয়নের মন্দিরের চারদিকে রয়েছে আরও কয়েকটি অট্টালিকা। আঙ্কোরথম দেখতে বর্গাকার—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২ মাইল। রাজধানীর মধ্যে রয়েছে বিরাট বিরাট কয়েকটি জলাশয়। শিল্প-সৌন্দর্যের দিক থেকে সে আমলে আঙ্কোরথম ছিল বিশ্বের সবচেয়ে সেরা নগরী।*

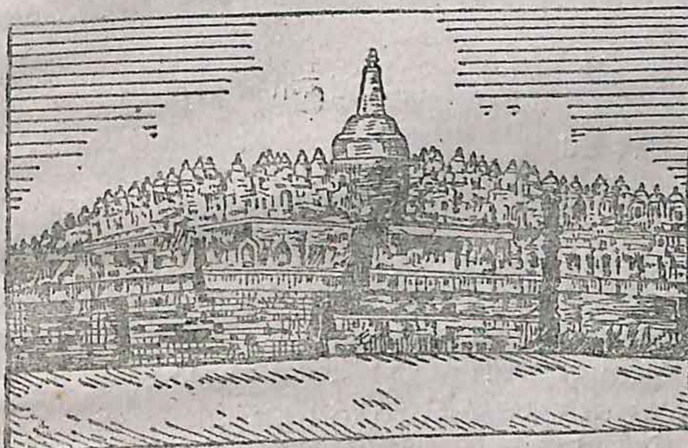
* Advanced History of India—Roychawdhuri, Majumdar and Dutta, Page 210.

মালয় উপদ্বীপ ও জাভা—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের অধীনে একটি শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। ধীরে ধীরে সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপগুলিতেও শৈলেন্দ্র রাজাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। আরব বণিকগণ শৈলেন্দ্র রাজাদের শক্তি ও সমৃদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এই বংশের রাজাদের উপাধি ছিল 'মহারাজা'। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। চীন এবং ভারতের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজারা দূত বিনিময় করতেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে শৈলেন্দ্র বংশের খুবই হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পাল রাজাদের আমলে বাংলাদেশ ছিল বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। শৈলেন্দ্র রাজারা খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশ থেকেই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা পেয়েছে। তাঁরা 'মহাযান বৌদ্ধধর্মে'র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাঙালী বৌদ্ধ-পণ্ডিত 'কুমার ঘোষ' ছিলেন তাঁদের কুলগুরু। এই বংশের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। এই মঠের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দানের অনুরোধ করে পাল বংশের রাজা দেবপালকে অনুরোধ করে তিনি একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, দেবপাল তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্কের আরও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। একাদশ শতকে শৈলেন্দ্র রাজা চূড়ামণি বর্মন ভারতের নাগপত্তমে (বর্তমান নেগাপতম্) একটি বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ করা শুরু করেছিলেন। এই বৌদ্ধ বিহারের নাম ছিল শৈলেন্দ্র চূড়ামণি বৌদ্ধ-বিহার। ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে চোলরাজ রাজরাজ এই মন্দিরের ব্যয় সংকুলানের জন্য একটি গ্রাম দান করেছিলেন। আনুমানিক ১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দে চোল রাজ কুলোত্তুঙ্গ চোল শৈলেন্দ্র নৃপতির অনুরোধে ঐ গ্রাম থেকে কর আদায় বন্ধ রাখেন।

বরবুদুর—শৈলেন্দ্র রাজগণ শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের আমলেই বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হয়েছিল। এই বিশাল স্তূপটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। স্তূপটি ভূমিতল থেকে মাথা পর্যন্ত পরপর নয়টি স্তর বা থাকে বিভক্ত। নীচের থাকটি সবচেয়ে দীর্ঘ। এর দৈর্ঘ্য ১৩১ গজ। তারপর যতই উপরে ওঠা যায় প্রতিটি থাকের দৈর্ঘ্য

ততই কমে আসে। সবচেয়ে উঁচু থাকের কেন্দ্রস্থলে একটি স্তূপ দাঁড়িয়ে—দেখতে ঘণ্টার মত। নীচের চারটি থাক ছিল ভেতরের দিক থেকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এর ফলে চারটি 'গ্যালারি'র সৃষ্টি হয়েছিল। উপরের তিনটি থাকের চারদিকে বহু স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রতিটি স্তূপের মধ্যেই ছিল একটি করে বুদ্ধ মূর্তি। গ্যালারিগুলিতে শিল্পীগণ নৈপুণ্যের সঙ্গে জাতকের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন। তার ফলে গ্যালারিগুলির



বরবুদুরের বৌদ্ধ-স্তূপ

সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বরবুদুরের বৌদ্ধ-স্তূপটির মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট। এর বিশাল আকার, সুন্দর গ্যালারি, বৌদ্ধ-মূর্তি ও অপূর্ব শিল্পশোভা—সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করে। অনেকে বরবুদুরের মন্দিরকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য রূপে অভিহিত করেছেন।

ভারতের সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব স্থানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত—এই দু'টি মহাকাব্য এসব অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই দু'টি মহাকাব্যের ঘটনাকে অবলম্বন করে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। এইসব কাব্যের মধ্যে দ্বাদশ শতকের 'ভারত-যুদ্ধ কাব্য' সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত শান্তি-

পূর্ণ উপায়ে। এর জন্য ভারতকে কোন সৈন্য-সামন্ত পাঠাতে হয়নি। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিকে বৃহত্তর ভারত আখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এইসব অঞ্চলে খুব বেশী ছিল সন্দেহ নাই; তবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাটি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই রোমিলা থাপারের মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিকে বৃহত্তর ভারত* অ্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয়।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। মধ্য এশিয়ার কোন্ কোন্ স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছিল?
২। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইতিহাস বিবৃত কর।
৩। বাংলাদেশ থেকে তিব্বতে কারা গিয়েছিলেন? তাদের অবদান কি ছিল?
৪। কম্বোজ রাজ্যে ভারতীয় উপনিবেশ কি করে স্থাপিত হয়?
৫। আঙ্কোরভাট মন্দিরের বর্ণনা দাও।
৬। 'আঙ্কোরথম' কোথায় অবস্থিত? বেয়নের মন্দির সম্পর্কে যা জান লেখ।
৭। বরবুদুরের মন্দিরের একটি বিবরণ দাও।
৮। শৈলেন্দ্র নৃপতিদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে লেখ।

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দাও: ১। কুমারজীব কোন্ স্থানের অধিবাসী ছিলেন? ২। বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্যের নাম কি? ৩। সুবর্ণভূমি কোন্ অঞ্চলকে বলা হয়? ৪। চম্পা রাজ্যটির বর্তমান নাম কি? ৫। আঙ্কোরথমের রাস্তা কত চওড়া? ৬। শৈলেন্দ্র নৃপতিদের কুলগুরু কে ছিলেন? ৭। বরবুদুরের বৌদ্ধ স্তূপটির মোট আয়তন কত?

ডানদিকে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও:

১। মধ্য এশিয়ায় খনন করে বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, সংস্কৃত ও পালিভাষায় লেখা বহু পুঁথিপত্র উদ্ধার করেছেন
(হিউয়েন-সাং / স্যার অরেল স্টেইন / স্যার জন মার্শাল)।

২। চীনা ভাষায় কম্বোজ রাজ্যকে বলা হয়েছে (তুয়েন সিয়েন / ফু-নান / সো-লিং)।

---

*History of India—Romila Thapar, Page 122.

৩। আঙ্কোরথম নির্মাণ করেছিলেন (প্রথম জয়বর্মন / তৃতীয় জয়বর্মন / সপ্তম জয়বর্মন)।
৪। বেয়নের মন্দিরটি দেখতে (পিরামডের মত / গোলাকার / আয়তাকার)।
৫। নালন্দায় মঠ নির্মাণ করেছিলেন শৈলেন্দ্রবংশের রাজা (চূড়ামণি বর্মন / বালপুত্র দেব / কৌণ্ডিণ্য)।

**শূন্যস্থান পূরণ কর**

১। — বিহার ছিল দীপঙ্করের প্রধান কর্মকেন্দ্র।
২। — — তিব্বতে লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন।
৩। আঙ্কোরথম দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে — ও —।
৪। — ভারতের নাগপত্তমে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করা শুরু করেছিলেন।
৫। বরবুদুরের বৌদ্ধ স্তূপটির মোট আয়তন —।

**ভুল বাক্যকে ঠিক করে লেখ :**

(১) ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে বিস্তারলাভ করে। (২) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। (৩) বাংলাদেশে দীপঙ্করের মৃত্যু হয়। (৪) কথিত আছে কৌণ্ডিণ্য যুদ্ধ করে কম্বোজ রাজবংশের পত্তন করেন। (৫) বরবুদুরের বৌদ্ধ স্তূপটি ভূমিতল থেকে মাথা পর্যন্ত বারোটি স্তর বা ভাগে বিভক্ত।

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# দিল্লীর সুলতানী আমল (১২০০—১৫২৬ খ্রীঃ)

পাঠ-সংকেত—তুর্কী-আফগানদের ভারত আগমণ ● রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ● হিন্দুধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক ● শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতি ● শিল্প ● শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ● ভক্তিবাদ ও মধ্যযুগের সাধকবৃন্দ ● ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলাদেশ ● সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ● শাসন ব্যবস্থা।

অষ্টম শতকে বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে মুসলমান জগতের পরিচয় হয়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন করা, রাজ্যস্থাপন করা নয়। ঘুররাজ্যের অধিপতি তুর্কী বীর মহম্মদ ঘুরী ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় নৃপতি পৃথ্বীরাজকে তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত করে দেশে ফিরে যান। ভারতের বিজিত অংশ শাসনের দায়িত্ব তাঁর অনুচর ও সেনাপতি

কুতুবুদ্দিন আইবকের উপর ন্যস্ত হয়। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হলে কুতুবুদ্দিন স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন। তিনি হলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান। কুতুবুদ্দিনের সময় থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কী-আফগান সুলতানগণ দিল্লীতে তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখে। সেইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১২০৬—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় 'তুর্কী-আফগান সুলতানী যুগ।'

**তুর্কী-আফগানদের ভারত আগমন**—এই সময়ে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ভাগ্য ফেরাতে দলে দলে বিভিন্ন জাতির লোক ভারতে এসেছিল। এদের মধ্যে ছিল মোঙ্গোল, আফগান, তুর্কী, পারসী, আরব ও আবিসিনীয়রা। স্থানীয় ভারতীয়দের সম্পর্কে তুর্কী-শাসকদের মনে নানা সন্দেহ ছিল। সে জন্য তারা উচ্চপদে বহিরাগত মুসলমানদের নিযুক্ত করতেন। আর এই সব মুসলমান প্রশাসকগণ সুযোগ পেলেই ক্ষমতা দখল করে নিতেন। অনেকেই এভাবে সুলতান হয়েছিলেন।

**রাজনৈতিক অবস্থা**—কুতুবুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত সুলতানী বংশ ইতিহাসে 'দাস বংশ' নামে পরিচিত। ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে এই বংশ রাজত্ব করেছিল। ইলতুৎমিস ও গিয়াসুদ্দিন বলবন্ ছিলেন দাসবংশের উল্লেখযোগ্য সুলতান। তাঁরা ওমরাহদের প্রতিপত্তি খর্ব করেছিলেন; চারদিকের বিদ্রোহ শক্ত হাতে দমন করে সুলতানীকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। দাস-বংশের পরে প্রতিষ্ঠিত হল খলজী বংশ। খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬—১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। আলাউদ্দিন বাহুবলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি গুজরাট, রনথম্ভোর, চিতোর, মালব, পাণ্ডু, ধার ও চান্দেরী জয় করেছিলেন। তবে গুজরাট ও চিতোরে তাঁর আধিপত্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।


আলাউদ্দিন খলজী

আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক-কাফুর দেবগিরি ও বরংগল জয় করে সুদূর দক্ষিণে মাদুরা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আলাউদ্দিন কিন্তু দাক্ষিণাত্য নিজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না এনে শুধু কর আদায় করেই সন্তুষ্ট রইলেন। আমীর-ওমরাহদের প্রতি তিনি কঠোর ছিলেন। এছাড়াও তিনি শস্য ও উৎকৃষ্ট সূতীবস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

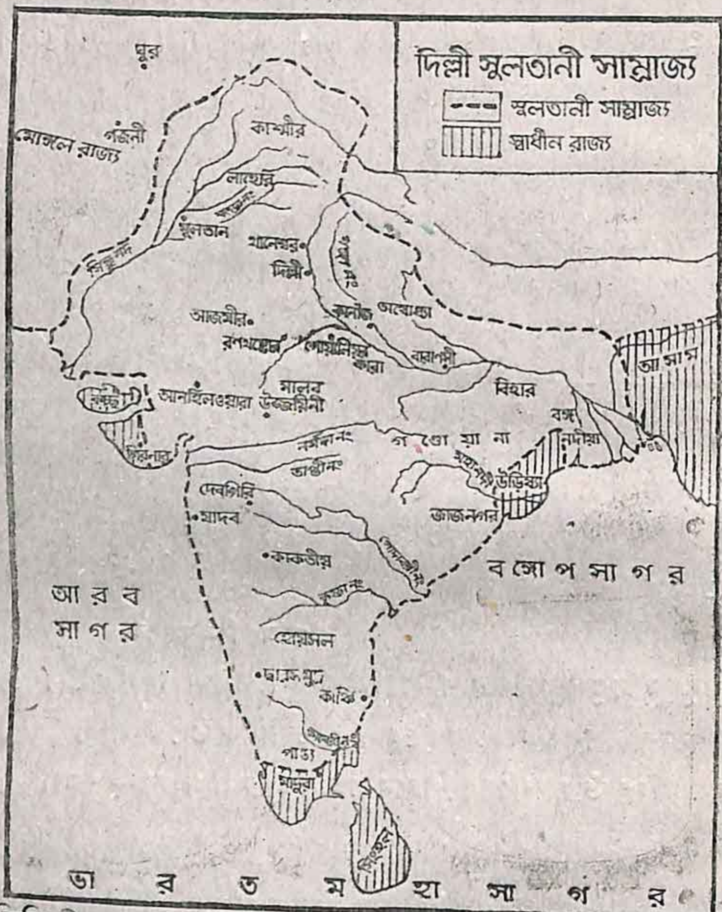
খল্‌জী বংশের শেষ সুলতানকে ১৩২০ খ্রীঃ-এ নিহত করে সুলতান হলেন গিয়াসুদ্দিন তুঘলক্‌। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম তুঘলক্‌ বংশ। গিয়াসুদ্দিনের পরে সুলতান হলেন তাঁর পুত্র জুনা খাঁ। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলক্‌ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান থাকাকালীন তাঁর অভিনব ক্রিয়া-কলাপের জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে 'পাগল' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাজের পিছনে কোন যুক্তি ছিল না—একথা বলা চলে না।


মহম্মদ বিন্‌-তুঘলক্‌

আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি গঙ্গ-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে কৃষকেরা ব্যাপক বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ দমন করে কর নীতির পরিবর্তন করা হ'ল। কিন্তু দোয়াব অঞ্চলে এবার দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। তখন আবার তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে বিনামূল্যে ছ'মাস ধরে খাদ্য বিতরণ করেন।

দাক্ষিণাত্যের দিকে ঠিকমত নজর দেওয়ার জন্য মহম্মদ বিন্‌-তুঘলক তাঁর রাজধানী দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে সরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর আদেশে দিল্লীর প্রতিটি অধিবাসীকে দৌলতাবাদে যেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নতুন

স্থান পছন্দ না হওয়ায় আবার কয়েক বছরের মধ্যে রাজধানী দিল্লীতেই ফিরিয়ে আনা হ'ল।




তিনি চীন ও পারস্যের নৃপতিদের অনুকরণে তামার ও পিতলের মুদ্রা বাজারে ছাড়লেন। কিন্তু জাল করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সতর্কতা না নেওয়ায় জাল নোটে দেশে ছেয়ে গেল। বিদেশী বণিকেরা এই নোট নিতে অস্বীকার করায় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল। সুলতান তামার নোট বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু মহম্মদের রাজত্বকালের শেষের দিকে চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনী নামে দু'টি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মহম্মদ বিন্-তুঘলক ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে প্রাণত্যাগ করেন।

মহম্মদ বিন্-তুঘলকের পর থেকেই তুঘলক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন এল খুব তাড়াতাড়ি। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে প্রদেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করল। সুলতানী আমলের এই দুর্দিনে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দের তুর্কী-বীর তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করে। এই আক্রমণ তুঘলক বংশের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

তুর্কী-আফগান যুগের শেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে তিনি বাবরের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের ফলেই ভারতে তুর্কী-আফগান যুগের শেষ হ'ল। বাবর মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন।

সামাজিক অবস্থা—ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতীয় হিন্দুদের অনেকেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা ছিল প্রধানতঃ নিম্নবর্ণের হিন্দু; অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দুও ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তবে হিন্দু ও মুসলমান, পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখত।

ইসলাম ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে হিন্দু সমাজপতিগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। তাই 'জাতিভেদ-প্রথা' আগের থেকে আরও অনেক বেশী কঠোর হয়।

সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের নারী জাতির কোন স্বাধীনতা ছিল না। সমাজে তাদের স্থান ছিল নীচুতে। হিন্দুসমাজে 'সতী প্রথা' ও 'জৌহর প্রথা' এবং মুসলমান সমাজে 'পর্দা প্রথা' চালু ছিল।

ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) অভিজাত, (২) কারিগর ও (৩) কৃষক। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ছিল অনেক গোষ্ঠীর লোক—তুর্কী, আফগান, পারসী ও আরবী। আভিজাত্য বংশানুক্রমিক ছিল না। সুলতানের মর্জির উপর এগুলি নির্ভর করত।

মুসলমান কারিগররা বাস করত শহরাঞ্চলে; গ্রামে থাকত কৃষকেরা।

অর্থনৈতিক অবস্থা—দেশের অধিকাংশ লোকের জীবিকা ছিল কৃষি। কিন্তু কৃষকদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। অত্যধিক রাজস্বের চাপে তারা পিষ্ট হ'ত। কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা রাজস্ব সুলতান ও অভিজাত সমাজের জাঁক-জমকের পেছনে খরচ করা হ'ত। আমীর খসরুর

ভাষায়—'সুলতানের মুকুটের মনি-মুক্তা যেন দরিদ্র কৃষকদের জমাট বাঁধা অশ্রু।'

বিদেশী তুর্কী-আফগানরা অধিকাংশই শহরাঞ্চলে বসবাস করত। তার ফলে এসব অঞ্চল সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। শহরের প্রয়োজন মেটাতে কারিগররা এসে এখানে বাস করতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে এগুলি বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হ'ল। গুজরাট ও বাংলাদেশের সূতীর কাপড়, রেশম, মখমল, সার্টিন ছিল খুবই নামকরা। বৈদেশিক বাণিজ্যও বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। চীন, জাভা, মালয়, সুমাত্রা, মালাক্কা, এডেন প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

হিন্দুধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক—ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশ কয়েক শতক পাশাপাশি বাস করায় উভয়েই উভয়ের উপর প্রভাব ফেলেছিল। উচ্চবর্ণের লোক অপেক্ষা নিম্নবর্ণের লোকেদের ক্ষেত্রে দুই সংস্কৃতির মিলনের প্রকাশ বেশী দেখা যায়। ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারায় এই মিলনের প্রমাণ আছে। সুলতানী আমলের স্থাপত্যশিল্পে এই মিলনের চিহ্ন পরিস্ফুট।

শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতি—দিল্লীর সুলতানগণ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতানীযুগের সবচেয়ে সেরা পণ্ডিত ও কবি ছিলেন আমীর খসরু। তিনি গীতি-কবিতা, শোককাব্য—ফারসী ভাষায় রচনা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক রচনাও বিখ্যাত ছিল। মোঙ্গোলদের ভয়ে বহু পারসিক পণ্ডিত দিল্লীর দরবারে এসেছিলেন। এ যুগের শেখ নিজামুদ্দিন হাসানের (হাসান-ই-দেহ্‌লবি) পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারধারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শিল্প—ভারতে তুর্কী-আফগান মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'লে আরব ও পারস্যের স্থাপত্যরীতিও এখানে প্রবেশ করে। খিলান, গম্বুজ প্রভৃতি ছিল পারস্যরীতির বৈশিষ্ট্য। সুলতানরা মসজিদ বা কোন অট্টালিকা নির্মাণ করতে হলে ভারতীয় কারিগর নিয়োগ করতেন। আবার অনেক সময় হিন্দুমন্দির ভেঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন করে তাকেই মসজিদে রূপান্তরিত করে নেওয়া হ'ত। এইভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ইসলামী স্থাপত্যরীতির মিলনের ফলে এক নতুন ধরনের 'স্থাপত্য শিল্পরীতি'র

উদ্ভব হয়। ভারতীয় ইসলামী স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হ'ল দিল্লীর কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ। জৈনমন্দির ভেঙ্গে কুতুবুদ্দিন আইবক্ ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। 'কুতুবমিনার' সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পে কৃতিত্বের একটি উদাহরণ।

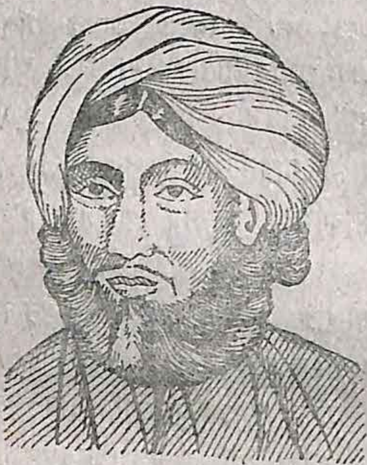
**শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ**—আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নতির ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সংস্কৃতে লেখা ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণ সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। কিন্তু এখন এগুলি বাংলা, মারাঠি, হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হ'ল। ফিরুজ তুঘলকের আমলে ৩০০ হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।


শ্রীচৈতন্যদেব

**ভক্তিবাদ ও মধ্যযুগের সাধকবৃন্দ**—তুর্কীরা ক্ষমতা দখল করার পর সূফী মতাবলম্বীরা ভারতে এসেছিল। তাদের মতবাদ এদেশের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করে। নতুন ধরনের এই চিন্তা-ভাবনাকে বলা হয় ভক্তিবাদ। এই ভক্তিবাদ প্রথম প্রচার করেন রামানুজ। রামানুজের শিষ্য রামানন্দ জাতি-নির্বিশেষে সকলের কাছেই ভক্তিবাদ প্রচার করেন। বাংলাদেশে ভক্তিবাদকে জনপ্রিয় করেন শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)। চৈতন্যদেব বাংলাদেশের অন্তর্গত নদীয়া জেলার নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণ-ভারত, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে তিনি বৈষ্ণবধর্মের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর চেষ্টায় সকল জাতির অগণিত নর-নারী বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। জীবে দয়া, সকল জীবে সমদর্শন ও ঈশ্বর ভক্তি—তাঁর ধর্মের মূলকথা।

ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন কবীর ও নানক। কবীরের জন্ম তন্তুবায় পরিবারে। প্রথম জীবনে তিনি রামানন্দের ভক্ত ছিলেন; পরে তিনি নিজস্ব ধারণার কথা প্রচার করেন। তাঁর রচিত দু'লাইনের

শ্লোকগুলিকে বলা হয় 'দোঁহা'। কবিরের দোঁহাগুলি সহজ, সরস ও মাধুর্যপূর্ণ। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখতেন না। তাঁর দোঁহাতে আছে—'করিম ( আল্লা ) ও রাম উভয়ই আছেন হৃদয়ে। এ জগতের সমস্ত মানব-মানবীই তাঁর অংশ...।' হিন্দু মুসলমান সকলই তাঁর শিষ্যত্ব নিয়েছিল।



ভক্ত কবীর



নানক

নানক (১৪৬৯—১৫৩৯ খ্রীঃ)—পাঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম। তিনি প্রথম জীবনে সূফীদের সঙ্গে মিশেছিলেন। পরে সূফী-সঙ্গ ছেড়ে বহু দেশে তিনি ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেন। ঈশ্বরে ভক্তি, নিষ্ঠা ও অন্তরের পবিত্রতার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। কবীরের মত তাঁর কাছেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না।

## ॥ ইলিয়াস্ শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলাদেশ ॥

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে ইলিয়াস্ শাহী বংশ ও হুসেন শাহী বংশ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ইলিয়াস শাহীবংশ ( ১৩৪২ খ্রীঃ ) প্রতিষ্ঠা করেন। হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

ইলিয়াস্ শাহ ও হুসেন শাহের আমল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাংস্কৃতিক অবস্থা : শিল্প—এই যুগে স্থাপত্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের আমলে পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটির আকৃতি বিশাল—দৈর্ঘ্যে ৫০৭ ফুট, প্রস্থে ২৮৫ ফুট। হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির ভেঙে তার বিভিন্ন অংশ এই মসজিদটিতে ব্যবহার করা হ'য়েছিল। কোতোয়ালী দরওয়াজা এই সময়ের স্থাপত্যের আর একটি নিদর্শন। হুসেন শাহী বংশের আমলে ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল নির্মিত হয়। বাংলাদেশে পাথরের অভাব থাকায় মসজিদ নির্মাণে পাথরের সঙ্গে ইটের ব্যবহার করা হ'য়েছিল।

সাহিত্য—সুলতানী আমলেই বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করে। মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস ছিলেন হুসেন শাহের সময়ের বিখ্যাত লেখক। বাংলায় ভাগবত অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এর জন্য হুসেন শাহ মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে একজন কবি মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীকর নন্দী ও কবিরঞ্জন এই যুগে কাব্য রচনা করে যশ অর্জন করেছেন। কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করায় এই মহাকাব্য খুবই জনপ্রিয় হয়।

সামাজিক অবস্থা—হুসেন সাহের উদারতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উচ্চপদে তিনি বহু হিন্দুকে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর উজীর ছিলেন পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু)। রূপ ও সনাতন গোস্বামী—দুই ভাই ছিলেন তাঁর দবীর খাস (নিজস্ব সচিব)। হুসেন শাহের উৎসাহে বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজার প্রচলন হয়। এই পূজার প্রচলন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করেছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা—অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ সুলতানী আমলে খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। এখানকার মাটি উর্বরা; তাতে ফলত প্রচুর ফসল। বাংলাদেশে উৎপন্ন কাপড় ছিল খুবই বিখ্যাত। চীন ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। চীনের মিঙ্ সম্রাটরা বাংলাদেশে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রতিনিধি দল পাঠাতেন। চীনা পর্যটক চেঙ্ হো ১৪২১ ও ১৪৩২ খ্রীঃ-এ

দু'বার বাংলাদেশে এসেছিলেন। মিঙ্ সম্রাটদের ঐতিহাসিক বিবরণীতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

**শাসন-ব্যবস্থা**— রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে ছিলেন সুলতান। তিনি ছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সামরিক বাহিনীর ওপরে নির্ভরশীল ছিল।

সুলতানকে শাসনকার্যে সহায়তা করার জন্য প্রথমে চারজনের একটি মন্ত্রী সভা ছিল। এই চারজন হ'ল— ওয়াজির (প্রধান মন্ত্রী), আরিজ-ই-মামালিক (সৈন্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী), দিওয়ান-ই-ইন্সা (যোগাযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী), দিওয়ান-ই-রাসালাৎ (বৈদেশিক ও কূটনৈতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)। পরবর্তীকালে আরও দু'জন মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভায় নেওয়া হয়— সদর-উস্-উদুর (ধর্মীয় দান খয়রাৎ বিষয়ক মন্ত্রী) ও দিওয়ানি-ই-কুজা (বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী)। মন্ত্রীসভার পরামর্শ সুলতান ইচ্ছা করলে গ্রহণ নাও করতে পারতেন। সুলতানের ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত।

সুলতানী রাজ্য অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হত মুক্‌তি। প্রদেশ শাসন ও রাজস্ব আদায় ছিল শাসনকর্তার কাজ। রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ তিনি বেতন হিসাবে পেতেন। সুলতানের প্রয়োজনের জন্য মুক্‌তি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও ঘোড়া রাখতে পারতেন।

সুলতানগণ তাঁদের অনুচরদের জমিদারী দান করতেন। এই জমিদারীকে বলা হ'ত ইক্‌তা। ইক্‌তাদারেরা নিজ-নিজ এলাকায় শান্তিরক্ষা করত। সুলতানকে তারা প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জোগাড় করে দিত। তাদের নিজস্ব সৈন্যদলও ছিল।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আলাউদ্দিন খলজীর কৃতিত্ব সম্পর্কে লেখ। ২। 'পাগলা রাজা' কাকে বলা হয়? তার কার্যকলাপ সম্পর্কে লেখ। ৩। সুলতানী যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কি জান? ৪। সুলতানী আমলে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ছিল?

৫। সুলতানী যুগের শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা কর। ৬। ভক্তিবাদ কাকে বলে? কোন্ কোন্ সাধক ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন? ৭। ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশের আমলে বাংলাদেশের শিল্পকলা সম্পর্কে কি জান? ৮। বাংলাদেশের হুসেন শাহী বংশের আমলে বাংলাদেশে কিরূপ সাহিত্য চর্চা হয়েছিল? ৯। বাংলাদেশে সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কিরূপ ছিল? ১০। সুলতানী যুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ।

## বিষয়মুখী প্রশ্ন

**এককথায় উত্তর দাও :** (১) দিল্লীর প্রথম সুলতানের নাম কি? (২) মালিক কাফুর কে? (৩) আমীর খসরু কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন? (৪) কুওয়াত-উল্-ইসলাম মসজিদ কে কত সালে তৈরী করেন? (৫) চৈতন্যদেবের ধর্মের মূল কথা কি? (৬) বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজার প্রচলন কে করেন?

**ডানদিকে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটিতে '√' চিহ্ন দাও :**

১। মহম্মদ বিন্-তুঘলকের আমলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় (বাংলাদেশে / দিল্লীতে / দোয়াব অঞ্চলে)।

২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় (১৩৯৮ খ্রীঃ / ১২৬৫ খ্রীঃ / ১৪৯৮ খ্রীঃ)।

৩। ভারতে মুসলমান সমাজ বিভক্ত ছিল (তিনটি শ্রেণীতে / দুটি শ্রেণীতে / চারটি শ্রেণীতে)।

৪। সুলতানী যুগের সবচেয়ে সেরা পণ্ডিত ও কবি ছিলেন (হাসান-ই-দেহলবি / মিনহাজুদ্দিন / আমীর খসরু)।

৫। তিনশত হিন্দুধর্মশাস্ত্র ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয় (মহম্মদ বিন্-তুঘলকের আমলে / ফিরুজ তুঘলকের আমলে / হুসেন শাহের আমলে)।

**ভুল বাক্যগুলিকে সঠিক করে লেখ :**

১। উচ্চ প্রশাসনিক পদে সুলতানীযুগে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হ'ত।

২। মহম্মদ বিন্-তুঘলক রাজধানী দিল্লী থেকে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

৩। নানকের রচিত দু'লাইনের শ্লোকগুলিকে বলা হয় দোঁহা।

৪। সিকেন্দার শাহের আমলে কদম রসুল নির্মিত হয়।

৫। সুলতানী যুগে প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হ'ত উজীর।

# চতুর্দশ অধ্যায়

## মধ্যযুগের অবসান ( চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক )

পাঠ-সংকেত—কনস্টান্টিনোপলের পতন ● রেঁনেসাসের উপর কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রতিক্রিয়া ● রেঁনেসাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ● অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদ ● জ্ঞানের সীমা প্রসারণ ● বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ● জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ● ডাচ্ বিদ্রোহ ● ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার ● পুরাতন সমাজ বনাম নতুন সমাজ ● ইংলণ্ডে বিদ্রোহ।

**কনস্টান্টিনোপলের পতন**—১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কী-সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেন। সম্রাট নবম কনস্টান্টাইন যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কনস্টান্টিনোপল তুর্কীদের দখলে আসে। কনস্টান্টিনোপলের পতন—ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পোপের নেতৃত্বে চার্চ ও সামন্ততন্ত্র মধ্যযুগের মানুষের চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের ইতিহাসে অনেকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। সামন্ততন্ত্র ও পোপের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র বিশেষতঃ ইতালিতে শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। শহরের মানুষের মনেও এর ফলে পরিবর্তন আসে। অজানাকে জানবার ও বিশেষতঃ নিজেদের অতীত ইতিহাসকে জানবার প্রবল স্পৃহা জন্মে। চিন্তাধারার এই পরিবর্তনকে বলা হয় 'রেঁনেসাস বা পুনর্জাগরণ'। ইতালির পেত্রার্ক ও বোকাসিও'র মধ্যে নতুন চিন্তাধারার প্রথম প্রকাশ দেখা দেয়। এরা দু'জনেই চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। পুরাতনকে জানতে হলে গ্রীক ও লাতিন ভাষা জানা প্রয়োজন। ইতালিতে লাতিন ভাষার চর্চা কিছু থাকলেও গ্রীক ভাষা সবাই ভুলে গিয়েছিল।

**রেঁনেসাসের উপর কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রতিক্রিয়া**—ইতালিতে গ্রীক ভাষার কোন শিক্ষক ছিল না। কনস্টান্টিনোপল থেকে দু'চার জন গ্রীক শিক্ষককে ফ্লোরেন্সে আনা হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রভাব ছিল সীমিত। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর গ্রীক পণ্ডিতগণ সেখান থেকে ইতালিতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বহু প্রাচীন গ্রীক পুঁথি। তাঁদের আগমনে ইতালির নগরীগুলি গ্রীক শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হ'ল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন গ্রীক দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয় ঘটল। শুধু ইতালিতেই

গ্রীক চর্চা আবদ্ধ রইল না—অল্প কিছুদিনের মধ্যে আল্পসের উত্তরে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়ল। তার ফলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে অল্প সময়ের মধ্যে রেঁনেসাস আন্দোলনেরও বিকাশ ঘটল। বলা বাহুল্য কনস্টান্টিনোপলের পত্তন না হলে এত দ্রুতগতিতে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে রেঁনেসাসের বিস্তার হ'ত না। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে রেঁনেসাসের সময় থেকেই আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে ; এবং সেইজন্য সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় যে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে আধুনিক যুগ।

॥ রেঁনেসাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ॥

অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদ—মধ্যযুগে চার্চের ছিল প্রবল প্রতাপ। চার্চ শিক্ষা দিত যে বাইবেল ও অন্যান্য সন্তদের গ্রন্থে যা লিখিত আছে সবই সত্য। এইসব গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনা যুক্তি ও প্রশ্নের অতীত। মধ্যযুগের মানুষ বিনা প্রতিবাদে এই ধর্মীয় গ্রন্থগুলির যুক্তি মেনে নিয়েছে। শিক্ষা ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার ফলে মানুষের চিন্তায় দেখা দিয়েছিল জড়ত্ব। কিন্তু ইউরোপে নানা কারণে পোপ ও চার্চের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় মানুষের মনে ক্রমশঃ যুক্তিবাদ জন্মলাভ করল। বিনা যুক্তিতে সে আর কোন কিছু মেনে নিতে চাইল না। তার মনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন জাগল। এর ফলে দেখা দিল তীব্র জ্ঞান-স্পৃহা।

জ্ঞানের সীমা প্রসারণ—মধ্যযুগের মানুষকে শেখানো হয়েছে যে জীবন মূল্যহীন। মৃত্যুর পরপারে যে জীবন—তাই সত্য। সুতরাং ইহজীবনের কথা চিন্তা না করে ধর্মচিন্তায় মগ্ন থাকলেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। সামন্ততান্ত্রিক যুগে এই ধারণা বলবৎ ছিল। তারপর একাদশ-দ্বাদশ শতকে ক্রমশঃ শহরের উৎপত্তি হ'ল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে শহরগুলি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। মানুষ দেখতে পেল তার চারদিকে রয়েছে জীবনকে উপভোগ করার প্রচুর উপকরণ। তখন থেকে পরলোকের আকর্ষণের চেয়ে পার্থিব সুখ-ভোগের প্রতি তার তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠল। শুধু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ইচ্ছাপূরণ হয় না। গ্রীক সাহিত্য পাঠ করে সে দেখল যে বহুযুগ আগে গ্রীক লেখকগণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়ে কাব্য, নাটক রচনা করে গিয়েছেন। শিল্পীগণ লক্ষ্য করলেন যে শুধু ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়েই গ্রীক শিল্পীগণ ব্যস্ত থাকেননি ; মানুষের আনন্দ-বেদনাকেও তাঁরা শিল্পে রূপ দিয়েছেন। তাই এই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জানবার জন্য তারা চেষ্টা করল। তার ফলে তাদের চিন্তার মুক্তি ঘটল— জ্ঞানও বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হ'ল।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হওয়ার ফলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়েছিল। চতুর্দশ শতকে কম্পাস বা দিক্ নির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গুটেনবার্গ নামে এক ব্যক্তি আধুনিক মুদ্রণ প্রণালী আবিষ্কার করলেন। তার ফলে গ্রন্থের অতি দ্রুত মুদ্রণ সম্ভব হ'ল। এতে গ্রীক চর্চা সারা ইউরোপে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভৌগোলিক আবিষ্কার—মধ্যযুগে চার্চের প্রভাবে মানুষের মন ছিল কু-সংস্কারে ভরা। দেশ ছেড়ে বাইরে পা দিতে তার মনে নানা ভয় ছিল। ইতিমধ্যে তার ভয় অনেক কমে গিয়েছে। তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেওয়ায় ভারতবর্ষ ও চীন থেকে স্থলপথে ইউরোপে পণ্যদ্রব্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। বাণিজ্যের স্বার্থে জলপথে চীন ও ভারতবর্ষে পৌঁছানোর পথ নাবিকগণ খুঁজতে আরম্ভ করল। এই অনুসন্ধানের ফলে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হ'ল। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। জলপথে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম পৌঁছলেন। নতুন দেশের আবিষ্কারও 'নবজাগরণ'-এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ফলে পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে উঠল। এতদিন আরব বণিকদের মাধ্যমে চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। কিন্তু এবার জলপথে এইসব দেশের সঙ্গে ইউরোপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। স্পেন ও পর্তুগাল আমেরিকা ও ভারতবর্ষে প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পেয়ে ধনী হয়ে উঠল।

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব—মধ্যযুগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। অখণ্ড পশ্চিম ইউরোপের ধর্মগুরু ছিলেন পোপ। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পবিত্র রোমান সম্রাট সব সময়ই বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তারে সচেতন থাকতেন। তখন পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণ নিজেদের খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের অধিবাসী বলে ভাবত। কিন্তু ক্রমশঃ সামন্ততন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ত এবং পোপের ক্ষমতাও হ্রাস পেল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে এক 'তৃতীয় শ্রেণীর' উদ্ভব হ'ল—যারা সামন্ত বা যাজক শ্রেণীভুক্ত নয়। তারা ভেবে দেখল যে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকার জরুরী প্রয়োজন ; এবং একমাত্র শক্তিশালী রাজতন্ত্রই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সুতরাং প্রতিটি দেশেই এই তৃতীয় শ্রেণী—রাজতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে রাজ-

তন্ত্রকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা সামন্তশ্রেণী হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়েছিল।

ডাচ বিদ্রোহ—নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের বলা হ'ত 'ডাচ'। ডাচরা কষ্টসহিষ্ণু ও ব্যবসায়ে পারদর্শী। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর বিত্তের মালিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নেদারল্যাণ্ডের কোন রাষ্ট্রীয়-ঐক্য ছিল না। সতেরোটি প্রদেশে সমগ্র নেদারল্যাণ্ড বিভক্ত ছিল এবং সমগ্র নেদারল্যাণ্ড ছিল স্পেন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। স্পেনের সম্রাট নেদারল্যাণ্ড থেকে প্রচুর কর আদায় করত। ক্রমশঃ নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মনে স্পেনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের দানা বাঁধে। তাদের ধারণা হল, যে পরিমাণ অর্থ নেদারল্যাণ্ড থেকে আদায় করা হয়, তা ব্যয় করা হয় স্পেন সম্রাটের স্বার্থে; নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য কোন অর্থই ব্যয় করা হয় না। এই অভিযোগের সঙ্গে ধর্মীয় কারণও যুক্ত হ'ল। ফলে নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার—শুধু জলপথ ও নতুন দেশ আবিষ্কারে স্পেন ও পর্তুগাল ক্ষান্ত রইল না, তারা ইউরোপের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হ'ল। পর্তুগালের রাজার প্রতিনিধি আলবুকার্ক আরব বণিকদের বিতাড়িত করে ভারতের পশ্চিম-উপকূলে কয়েকটি স্থান দখল করলেন। এই স্থানগুলি ক্রমশঃ পর্তুগীজ উপনিবেশে পরিণত হ'ল। স্পেনও আমেরিকা মহাদেশে সৈন্য পাঠিয়ে মেক্সিকো ও পেরু দখল করে নিল। পরবর্তীকালে স্পেন ও পর্তুগালকে অনুসরণ করে ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি আমেরিকা ও ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

পুরাতন সমাজ বনাম নতুন সমাজ—চার্চ ও সামন্ততন্ত্র মধ্যযুগের দু'টি প্রভাবশালী সংগঠন। সেকালের সমাজ-ব্যবস্থা এই দু'টি সংগঠনই নিয়ন্ত্রিত করত। সার্ফরা জমি চাষ করত। তাদের কী অশেষ কষ্টে জীবন-যাপন করতে হ'ত তা তোমরা আগেই পড়েছ। সামন্তশ্রেণী সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সামন্ত প্রভুদের উৎপীড়ন সার্কের পক্ষে মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চার্চও তাদের ইহজীবনের দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা করে বিনা প্রতিবাদে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পনের উপদেশ দিত। সমাজে ছিল দু'টি শ্রেণী—সামন্ত ও সার্ফ। সামন্তরাই যাবতীয় উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হ'ত।

ইতিহাসের নিয়মই এই যে—কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হয় না। সামন্ততন্ত্র ও চার্চের প্রতিপত্তিও চিরদিন রইল না। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে চার্চ ও সামন্ততন্ত্রে ভাঙ্গন দেখা দিল। সেই সঙ্গে সামাজিক ও আর্থিক বন্দোবস্তেরও পরিবর্তন হ'ল। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে শহরের উৎপত্তি হ'ল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে শহরগুলি বেশ ধনী হয়ে উঠল। শহরাঞ্চলে বণিক, কারিগর ও অন্যান্য জীবিকার লোক বাস করতে লাগল। তাদের সঙ্গে কৃষিকাজের প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই। এইভাবে সামন্ত ও সার্ফদের মধ্যবর্তী এক 'তৃতীয় শ্রেণীর' উদ্ভব হ'ল। জন্মসূত্রে তারা অভিজাত না হলেও নিজেদের কৃতিত্বে তারা মান-সম্মান লাভ করে। এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত অনেকেই যোগ্যতা-বলে রাজ্যশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ইংলণ্ডে বিদ্রোহ—সার্ফরাও আর তাদের পূর্ব পুরুষদের মত নীরবে সামন্ত-প্রভুর উৎপীড়ন সহ্য করতে রাজী হ'ল না। তাই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে দেখা দিল কৃষক বিদ্রোহ। ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে ইংলণ্ডে 'ওয়াট টাইলারে'র নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহ সমূলে উচ্ছেদ হলেও এর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। ক্রমশঃ নগদ মজুরীর বিনিময়ে ক্ষেত-খামারে কৃষকদের পরিশ্রম করার প্রথা প্রচলিত হ'ল। সার্ফরা তাদের বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করল। এইরূপে সামন্ততন্ত্র ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হ'ল।

## আদর্শ প্রশ্নাবলী

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ইতিহাসে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?
২। রেঁনেসাসের উপর কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?
৩। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে কেন যুক্তিবাদ জন্মগ্রহণ করল?
৪। রেঁনেসাসের যুগে মানুষের জ্ঞানের সীমা কিভাবে প্রসারিত হয়েছিল?
৫। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্পর্কে লেখ।
৬। ইংলণ্ডে কৃষক বিদ্রোহের গুরুত্ব কি?

### বিষয়মুখী প্রশ্ন

**এক কথায় উত্তর দাও :** (১) কনস্টান্টিনোপলের পতন কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল? (২) নতুন চিন্তাধারার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় কার কার মধ্যে? (৩) রেঁনেসাস কথার অর্থ কি? আধুনিক মুদ্রণ প্রণালী কে আবিষ্কার করেন? (৫) নেদারল্যাণ্ড কয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল? (৬) আরব বণিকদের বিতাড়িত করে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি স্থান দখল করেন কোন্ পর্তুগীজ? (৭) ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কৃষক বিদ্রোহের নেতার নাম কি?

---